নিরীক্ষা

ডিসেম্বর ২০২২

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২৪২ তম সংখ্যা

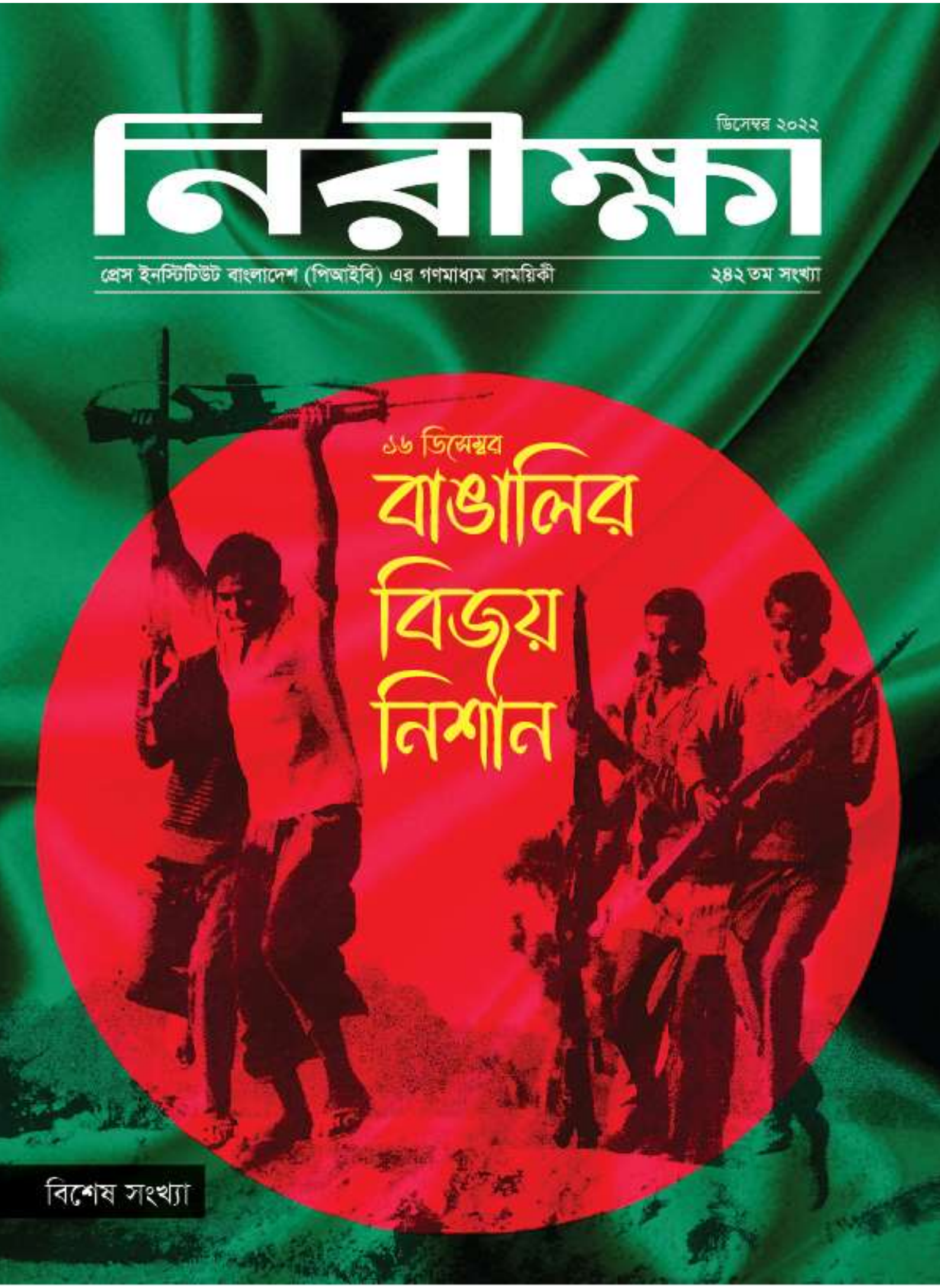

১৬ ডিসেম্বর

বাঙালির বিজয় নিশান

বিশেষ সংখ্যা

নিরীক্ষা

২৪২তম সংখ্যা: ডিসেম্বর ২০২২ (বিশেষ সংখ্যা)

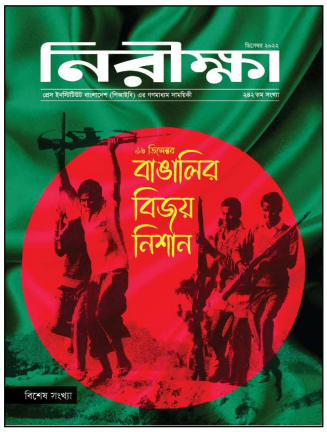

১৬ ডিসেম্বর, বাঙালি জাতির সবচেয়ে গৌরবময় অর্জনের দিন। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বিশ্বমানচিত্রে বাংলাদেশ নামের স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়। আজ আমরা সেই বিজয়ের ৫২তম বর্ষ উদ্‌যাপন করছি। এই দিনে আমরা স্মরণ করছি সেই শহিদদের, যাঁরা নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে আমাদের এই লাল-সবুজের পতাকা দিয়েছেন। স্মরণ করছি, ৩০ লাখ শহিদকে, যাঁরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন। স্মরণ করছি, অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যাঁরা জীবনের মায়া ত্যাগ করে লড়াই করেছেন পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বাঙালি জাতির অবিস্মরণীয় নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর দূরদর্শী আহ্বানে সর্বস্তরের বাঙালি মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। স্মরণ করছি ওই সময়ের কোটি কোটি মানুষকে, যাঁরা হানাদার বাহিনীর অত্যাচার-নিপীড়ন সহ্য করেছেন, ঘরবাড়ি ছেড়ে শরণার্থী হয়েছেন, বনে-জঙ্গলে রাত কাটিয়েছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করা বিভিন্ন রাষ্ট্র ও ব্যক্তির প্রতি। বাঙালি জাতি যতদিন বেঁচে থাকবে, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গৌরব করবে, অহংকার করবে।

প্রতি ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি নতুন করে শপথ নেবে এগিয়ে যাওয়ার, বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর। দিনটি আমাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় দিন, আনন্দের দিন হয়েই থেকে যাবে। কারণ সহস্র বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ১৯৭১ সালের এই দিনটিতেই বাঙালি জাতি প্রথমবার প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করেছিল। বিশ্বের মানচিত্রে একটি গর্বিত জাতি হিসাবে নিজেদের স্থান করে নিয়েছিল। আমাদের বিজয় এমনি এমনি আসেনি। এর জন্য আমাদের অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। অনেক রক্ত দিতে হয়েছে। অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করে উনসত্তরের গণ-আন্দোলন, সত্তরের নির্বাচন, একাত্তরের শুরুতে অসহযোগ আন্দোলনসহ অনেক আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের সেই মুক্তির ক্ষেত্র তৈরি করে নিতে হয়েছিল। ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ যেসব দেশ নানাভাবে সহযোগিতা করেছিল, তাদের ঋণও শোধ হওয়ার নয়। পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল দেশেরই কিছু কুলাঙ্গার। মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, পিডিপি, নেজামে ইসলামীর মতো কিছু রাজনৈতিক দল রাজাকার, আলবদর, আলশামসের মতো বাহিনী করে নিরীহ বাঙালি হত্যায় মেতে ছিল। পাকিস্তানিরা পরাজিত হয়ে ফিরে গেলেও তাদের দোসররা এ দেশেই থেকে গেছে। স্বাধীনতার একান্ন বছর পরও তারা পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে একের পর এক ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। জঙ্গি হামলাসহ নানা নাশকতার পাঁয়তারা করে যাচ্ছে। বিদেশি অপশক্তিও তাদের মদত জোগাচ্ছে। তাই বিজয় দিবসে আমাদের শপথ নিতে হবে। সব ষড়যন্ত্রের মূলোৎপাটন করতে হবে।

মূলত অর্থনৈতিক শোষণ, বঞ্চনা আর সীমাহীন বৈষম্যের প্রতিকারেই বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রাম শুরু হয়। ১৯৭১ সালের এই দিনে বিজয়লাভের পর বহু ষড়যন্ত্রের পথ পেরিয়ে বাংলাদেশ আজ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে চলছে। ক্রমাগত অর্থনৈতিক উন্নয়নের বদৌলতে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ এখন ইমার্জিং টাইগার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির ফলে দেশের বাজেটের আকার বেড়েছে, মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির পাশাপাশি জিডিপি বেড়েছে। অর্থনীতির ধাপগুলোয় বাংলাদেশের উন্নতি ইতিবাচক। উন্নয়নের নানা সূচকে অনেক দেশকে পেছনে ফেলে বীরদর্পে এগিয়ে চলছে। এককথায়–বাংলাদেশ আজ উন্নত বিশ্বে পা রাখার স্বপ্ন দেখছে। তবে করোনা মহামারি-পরবর্তী সময়ের ধাক্কা এবং চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী মন্দার ঢেউ এখন বাংলাদেশেও এসে পড়েছে। আমরা অবশ্যই বিজয় উল্লাস করব; কিন্তু বৈশ্বিক সংকটের এ সময়টিতে দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির কোনো বিকল্প নেই। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন স্মার্ট বাংলাদেশের পথ ধরে অগ্রগতির রথে এগিয়ে চলেছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বিশ্বে মর্যাদা লাভ করতে যাচ্ছে শীঘ্রই।

আমরা আশা করব, এ সময়ে বাংলাদেশ অবশ্যই সঠিক পথে থাকবে, তাহলেই পূরণ হবে আমাদের বিজয় দিবসের প্রত্যাশা।

সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ

সহকারী সম্পাদক
দুলাল কৃষ্ণ আচার্য

সহ-সম্পাদক
আকিল উজ জামান খান

শিল্প নির্দেশনা
সোহেল আশরাফ খান

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

প্রচ্ছদ: অমিয় তরফদারের ছবি অবলম্বনে

সূচিপত্র

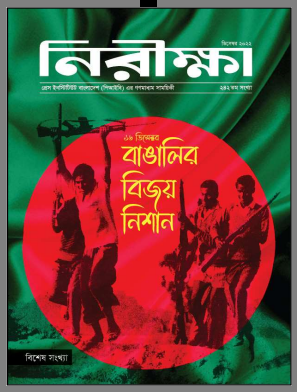

বিজয়ের পরিপূর্ণতা ও বঙ্গবন্ধু ৩
তোফায়েল আহমেদ

নেতা হিসাবে বঙ্গবন্ধু এক এবং অদ্বিতীয় ৬
—ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ

১৬ ডিসেম্বর আনন্দ-বেদনার কাব্য ১৩
মুহম্মদ শফিকুর রহমান

তেলিয়াপাড়ার যুদ্ধ ॥ মৃত্যুকে কাছ থেকে দেখা ১৮
মেজর জেনারেল (অব.) সুবিদ আলী ভূঁইয়া

স্বাধীনতা ও বিজয়ের ৫২ বছর ২১
রাষ্ট্র ও জাতিগঠনের গতিপ্রকৃতি
মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

ইতিহাসের সিঁড়ি বেয়ে বাংলাদেশ ২৩
তানভীর ইমাম

বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ২৬
অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান

৩১ সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের
আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির প্রতিফলন
ড. কামরুল হক

৩৯ স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু একসূত্রে গাঁথা
ড. হারুন রশীদ

৪২ বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিভূমি
ফারহানা মিলি

৪৫ ইতিহাসের কাছে নিয়ে যেতে হবে নতুন প্রজন্মকে
রাজন ভট্টাচার্য

৪৮ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের বিজয় দিবস
নিরঞ্জন রায়

৫১ এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধদিনের কথা
দেবেশ চন্দ্র সান্যাল

৫৪ বাঙালির হৃদয়-মননে ডিসেম্বর
জাফর ওয়াজেদ

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি'র সকল প্রকাশনা অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com
এবং বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

মূল্য ৪০ টাকা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

বিজয়ের পরিপূর্ণতা ও বঙ্গবন্ধু

তোফায়েল আহমেদ

মহান বিজয়ের ৫১তম বার্ষিকীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা-সর্বজনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামান-৩০ লক্ষাধিক প্রাণ আর ২ লক্ষাধিক মা-বোনের আত্মত্যাগকে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি।

সুদীর্ঘ ২৪ বছরের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের চূড়ান্তরূপ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ সার্বিক সাফল্য অর্জন করেছিল একাত্তরের ৩ ডিসেম্বর। আমরা তখন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে। মুক্তিবাহিনীর চতুর্মুখী গেরিলা আক্রমণে বিধ্বস্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনী এদিন উপয়ান্তর না দেখে একতরফাভাবে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পাকিস্তান বিমানবাহিনী পশ্চিম ভারতের বিমানঘাঁটিতে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সেদিন রাষ্ট্রপতি শ্রী ভিভি গিরি ও ঊর্ধ্বতন নেতাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক শেষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাত ১০টা ৩০ মিনিটে সমগ্র ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করেন। রাত ১২টা ২০ মিনিটে ইন্দিরা গান্ধী এক বেতার ভাষণে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে সাফ জানিয়ে দেন, 'আজ এই যুদ্ধ ভারতের যুদ্ধ হিসাবেও আত্মপ্রকাশ করল।' পরদিন ৪ ডিসেম্বর, মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ যৌথভাবে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি অর্জনে চিঠি লেখেন। চিঠির মূল বক্তব্য ছিল, 'যদি আমরা পরস্পর আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্কে প্রবেশ করি, তবে পাকিস্তান সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে আমাদের যৌথ অবস্থান অধিকতর সহজতর হয়। অবিলম্বে ভারত সরকার আমাদের দেশ এবং আমাদের সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করুক।' এর পরপরই ভারত পালটা আক্রমণ চালায় এবং ৬ ডিসেম্বর সোমবার, ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টায় ভারত সরকার স্বাধীন ও সার্বভৌম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'কে স্বীকৃতি দেয়। মুজিবনগরে প্রতিষ্ঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার

ঘোষণাপত্রে গৃহীত রাষ্ট্রের নাম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' উদ্ধৃত করে লোকসভার অধিবেশনে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, "বাংলাদেশ 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে অভিহিত হবে।" ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তৃতার পর সব সদস্য দাঁড়িয়ে তুমুল হর্ষধ্বনির মাধ্যমে এই ঘোষণাকে অভিনন্দন জানান। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভারতের সরকার ও জনসাধারণের ভূমিকা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

মুজিবনগরে গঠিত প্রথম বাংলাদেশ সরকার ও মুজিববাহিনীর জন্য ৬ ডিসেম্বর ছিল এক বিশেষ দিন। এদিন মুজিববাহিনীর অন্যতম প্রধান এবং ৮টি জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসাবে আমার নেতৃত্বাধীন অঞ্চল যশোর হানাদারমুক্ত হয়। যশোরের সর্বত্র উত্তোলিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। সেদিন মুজিবনগর সরকারের নেতারা এবং মুজিববাহিনীর কমান্ডাররাসহ আমরা বিজয়ীর বেশে স্বাধীন বাংলাদেশে শত্রুমুক্ত প্রথম মুক্তাঞ্চল যশোরে প্রবেশ করি। জনসাধারণ আমাদের বিজয়মাল্যে ভূষিত করে। সে আনন্দ-অনুভূতির কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অনেকে মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে মুজিববাহিনীর ভুল বোঝাবুঝির কথা বলেন। এটা সঠিক নয়। আমাদের হেডকোয়ার্টার ছিল কলকাতা বেইজড। আমি নিয়মিত মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতাম। মনে পড়ে জেনারেল ওবানের কথা। তিনি দেরাদুনে আমাদের ট্রেনিং দিতেন। জেনারেল, সরকার ও শ্রী ডিপি ধর, যাঁরা আমাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে কো-অর্ডিনেট করতেন। এখানে কারও ব্যক্তিগত খামখেয়ালির কোনো অবকাশ ছিল না। সবাই ছিলেন সুসংগঠিত, পরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল। সমগ্র বাংলাদেশকে ৪টি বৃহৎ অঞ্চলে বিভক্ত করে রাজনৈতিকভাবে অগ্রসর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে সংগঠিত ছিল মুজিববাহিনী। মুজিবনগর সরকারের প্রধান সেনাপতি আতাউল গণী ওসমানীর নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর (এফএফ) সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে মোকাবিলা করাই ছিল মূলত মুজিববাহিনীর কাজ। মুজিববাহিনীর অন্যতম প্রধান হিসাবে আমার দায়িত্বে ছিল পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালী। শেখ ফজলুল হক মণি ভাইয়ের দায়িত্বে ছিল তৎকালীন চট্টগ্রাম ডিভিশন। রাজ্জাক ভাইয়ের দায়িত্বে ছিল বৃহত্তর ময়মনসিংহ এবং সিরাজগঞ্জসহ এক বিরাট অঞ্চলের। উত্তরাঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন সিরাজ ভাই। মুজিববাহিনীর ট্রেনিং হতো দেরাদুনে। দেরাদুন থেকে ট্রেনিং শেষ করে আমার সেক্টরের যারা, তাদের প্লেনে করে ব্যারাকপুর ক্যাম্পে নিয়ে আসতাম। মুজিববাহিনীর সদস্যদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের প্রাক্কালে অশ্রুসিক্ত চোখে বুকে টেনে, কপাল চুম্বন করে বিদায় জানাতাম। আমরা মুজিববাহিনীর ট্রেনিং ক্যাম্পে বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু মুজিবকে উদ্দেশ করে বলতাম, 'প্রিয় নেতা, তুমি কোথায় আছ, কেমন আছ, জানি না! যতক্ষণ আমরা প্রিয় মাতৃভূমি তোমার স্বপ্নের বাংলাদেশকে হানাদারমুক্ত করতে না পারব, ততক্ষণ আমরা মায়ের কোলে ফিরে যাব না।' ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর যেদিন বিজয়ী হলাম, সেদিন আমরা সত্যিই মায়ের কোলে ফিরে এলাম। ১৮ ডিসেম্বর আমি এবং শ্রদ্ধেয় নেতা আব্দুর রাজ্জাক–আমরা দুই ভাই বিশেষ একটি হেলিকপ্টারে ঢাকায় আসি। স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পদার্পণ করি। চারদিকে সে কী আনন্দ, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! প্রথমেই ছুটে গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা, শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, শেখ রাসেলসহ যেখানে বন্দি করে রাখা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু পরিবারকে, সেখানে। কিন্তু বিজয়ের আনন্দ ছাপিয়ে কেবলই মনে পড়ছিল প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর কথা। যে স্বাধীন বাংলার স্লোগান তুলেছিলাম রাজপথে; যে বাংলার জন্য বঙ্গবন্ধুর গতিশীল নেতৃত্বে কাজ করেছি; পরম কাঙ্ক্ষিত সেই বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। আজ আমরা হানাদারমুক্ত, স্বাধীন। মুজিবনগর সরকারের নেতারা অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে, দলমতনির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে, আস্থা ও বিশ্বাসে নিয়ে, সফলভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ২২ ডিসেম্বর। বিমানবন্দরে নেতাদের বিজয়মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানাই। চতুর্দিকে লাখ লাখ মানুষ। মুক্তিযুদ্ধের রণধ্বনি 'জয় বাংলা' স্লোগানে সর্বত্র মুখরিত। চারদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের মহাসমাবেশ আর আনন্দ মিছিল। মানুষ ছুটে আসছে আমাদের দেখতে। বিজয়ের সে দিনগুলোয় সাধারণ মানুষের চোখে-মুখে গৌরবের যে দীপ্তি আমি দেখেছি, সেই রূপ চিরবিজয়ের গৌরবমণ্ডিত আলোকে উদ্ভাসিত। স্বজন-হারানোর বেদনা সত্ত্বেও প্রত্যেক বাঙালির মুখে ছিল পরম পরিতৃপ্তির হাসি, যা আজও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু বিজয়ের আনন্দ ছাপিয়ে কেবলই মনে পড়ছিল প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর কথা। যার সঙ্গেই দেখা হয়, সবার একই প্রশ্ন–'বঙ্গবন্ধু কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কবে ফিরবেন?' বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য সর্বস্তরের মুক্তিকামী বাঙালির ঘরে ঘরে রোজা রাখা, বিশেষ দোয়ার আয়োজন চলছিল। বঙ্গবন্ধুবিহীন বিজয় অপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে অক্টোবরে বঙ্গবন্ধুর ফাঁসির আদেশ হয়েছিল। দেশ স্বাধীন না হলে ডিসেম্বরেই বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হতো। কিন্তু আমরা জানতাম, বীর বাঙালির ওপর নেতার আস্থার কথা। তিনি তো গর্ব করে বলতেন, 'তারা আমাকে হত্যা করতে পারে। কিন্তু বাংলার মানুষকে তারা দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ওরা আমাকে হত্যা করলে লক্ষ মুজিবের জন্ম হবে।' ১৬ ডিসেম্বর হানাদারমুক্ত হয়ে বিজয় অর্জন করার পরও আমরা নিজদের স্বাধীন ভাবতে পারিনি। কারণ, বঙ্গবন্ধু তখনও পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। আমরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করেছি সেদিন, যেদিন বাহাত্তরের ১০ জানুয়ারি বুকভরা আনন্দ আর স্বজনহারানোর বেদনা নিয়ে জাতির পিতা তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসেছিলেন।

পাকিস্তানের কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিঃসঙ্গ বন্দিজীবন কাটিয়েছেন জাতির পিতা। মিয়ানওয়ালি কারাগারে তিনি কীভাবে জীবনযাপন করেছেন, কীভাবে মুক্তিলাভ করেছেন, সবিস্তারে তার বর্ণনা শুনেছিলাম চুয়াত্তরের ২৩ ফেব্রুয়ারি ওআইসি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসা মিয়ানওয়ালি কারাগারের প্রিজন গভর্নর হাবীব আলীর কাছে। গভীর শ্রদ্ধায় স্মৃতি তর্পণ করে একটানা বলেছিলেন, মিয়ানওয়ালি কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে বঙ্গবন্ধুর নয় মাস চৌদ্দ দিনের কঠিন কারাজীবনের কথা। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির আগের দিনগুলোর কথা স্মরণ করে তিনি আমাদের বলেছিলেন:

"বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বরের ১০ দিন পর ২৬ ডিসেম্বর রাতে মুজিবকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশের পরপরই একটা ট্রাক নিয়ে মিয়ানওয়ালি কারাগারের দিকে যাই। কারাফটক খুলে তাঁর সেলের কাছে গিয়ে দেখি তিনি একটা কম্বল জড়িয়ে বিছানার ওপর ঢুলছেন। মিয়ানওয়ালি কারাগারেই সেলের সামনে একটা কবর খনন করা হয়েছিল। শেখ মুজিব যখন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এটা কী?' তখন তাঁকে বলা হয়েছিল যে, 'যুদ্ধ চলছে, এটা বাংকার। শেল্টার নেওয়ার জন্য।' আসলে ছিল কবর। তখন মুজিবকে একজন কয়েদি বলছিল যে, 'আসলে এটা কবর। আপনি যদি আজ বের হন, আপনাকে মেরে এখানে কবর দেওয়া হবে।' তখন মুজিব আমাকে বলেছিল, 'কবরকে আমি ভয় পাই না। আমি তো জানি ওরা আমাকে ফাঁসি দেবে। কিন্তু আমি জানি, আমার বাংলাদেশ একদিন স্বাধীন হবে এবং আমি এও জানি, যে বাংলার দামাল ছেলেরা হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে, সেই বাঙালি জাতিকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না।' সেদিন তিনি মিনতি করে বলেছিলেন, 'আমাকে হত্যা করে এই কবরে না, এই লাশটি আমার বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিও।

যে বাংলার আলো-বাতাসে আমি বর্ধিত হয়েছি–সেই বাংলার মাটিতে আমি চিরনিদ্রায় শায়িত থাকতে চাই।' যা হোক, ওইদিন ২৬ তারিখে আমি ট্রাকে করে মুজিবকে নেওয়ার জন্য মিয়ানওয়ালি কারাগারে আসি। কারণ, ইতোমধ্যে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। ক্ষমতা হস্তান্তরকালে ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর কাছে প্রার্থনা করেছিল যে, 'আমার ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে শেখ মুজিবকে হত্যা করার অনুমতি দাও। আমার জীবনে যদি কোনো ভুল করে থাকি, তাহলে শেখ মুজিবকে ফাঁসিকাষ্ঠে না ঝুলানো।' তখন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো আমার কাছে এই মর্মে জরুরি বার্তা পাঠান যে, 'শেখ মুজিবকে কারাগার থেকে দ্রুত নিরাপদ কোনো স্থানে সরিয়ে ফেলা হোক।' তখন আমি মুজিবকে মিয়ানওয়ালি কারাগার থেকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে ট্রাক নিয়ে কারাফটকে আসি এবং সেলের মধ্যে গিয়ে শেখ মুজিবকে আমার সঙ্গে যেতে অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি আমাকে বাধা দেন। তখন আমি তাঁকে বলি, 'শেখ, আমি আপনার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমি আপনাকে এখান থেকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে এসেছি। কারণ, এখানে কমান্ডো আসতে পারে। তারা আপনাকে হত্যা করবে। আমার ওপর আপনি আস্থা রাখুন।' তারপর মুজিবকে ট্রাকে তুলে, ট্রাকের মধ্যে লুকিয়ে, আমার চশমা ব্যারাজ নামক বাড়িতে নিয়ে যাই। সেখানে গিয়েই তিনি একটা টেলিফোন করতে চান। মুজিব আমাকে বলেছিলেন, 'আমি কি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারি।' তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'না, আমার একমাত্র কাজ হলো আপনার জীবন রক্ষা করা। আপনি টেলিফোন করতে পারবেন না।' তখন তিনি বললেন, 'আমি কি খবরের কাগজ পড়তে পারি।' আমার উত্তর ছিল, 'না'। এরপর বললেন, 'আমি কি এক কাপ চা পেতে পারি।' তখন তাঁকে এক কাপ চা দেওয়া হয়। আমার বাড়িতে তিনি দুইদিন থাকেন। দিন দুইদিন পর শেখ মুজিবকে নিয়ে যাই শাহুল্যা নামক স্থানে। যেটা একসময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর রেস্টহাউজ ছিল। পিন্ডি থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে এই শাহুল্যাতে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। ভুট্টো যখন আসেন, তখন একজন কর্নেল এসে মুজিবকে বলছিল, 'পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসবে।' তারপর সেখানে ভুট্টো এলেন এবং মুজিবকে সালাম দিয়ে বললেন, 'নাউ আই অ্যাম দ্য প্রেসিডেন্ট অব পাকিস্তান অ্যান্ড চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর।' তারপরই শেখ মুজিবের প্রশ্ন ছিল, 'ভুট্টো, টেল মি ফার্স্ট, হোয়েদার আই অ্যাম এ ফ্রি ম্যান অর প্রিজনার।' তখন ভুট্টো উত্তর দিয়েছিলেন, 'নাইদার ইউ আর এ প্রিজনার, নর ইউ আর এ ফ্রিম্যান।' তখন শেখ মুজিব বললেন, 'ইন দ্যাট কেইস আই উইল নট টক টু ইউ।' তখন জুলফিকার আলী ভুট্টো বলতে বাধ্য হলেন যে, 'ইউ আর এ ফ্রিম্যান।' এরপর শেখ মুজিব প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। তারপর সে অনেক রকমের প্রস্তাব দিল। কীভাবে একটা কনফেডারেশন করা যায়, কীভাবে একসঙ্গে থাকা যায় প্রভৃতি। কিন্তু শেখ মুজিব কোনো কথাই বললেন না। চুপ করে থেকে শুধু বললেন, 'যতক্ষণ আমি আমার প্রিয় সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে না পারব, ততক্ষণ আমার পক্ষে কিছুই বলা সম্ভব নয়।' এরপর শেখ মুজিবকে একটা যৌথ ইশতাহার দেওয়া হয়েছিল সই করার জন্য। মুজিব সেটাও প্রত্যাখ্যান করলেন। পরিশেষে শেখ মুজিব বললেন, 'আমি কি এখন দেশে যেতে পারি?' ভুট্টো বললেন, 'হ্যাঁ, যেতে পারেন। কিন্তু কীভাবে যাবেন? পাকিস্তানের পিআইএ ভারতের ওপর দিয়ে যায় না।' তখন মুজিব বললেন, 'সেক্ষেত্রে আমি লন্ডন হয়ে যাব।' এরপর ৮ জানুয়ারি শেখ মুজিব মুক্তি পেয়ে পিআইএ-এর একটি বিশেষ বিমানে লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করেন।"

"কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তিলাভ এবং ভুট্টোর সঙ্গে কথোপকথনের স্মৃতিচারণা শেষে হাবীব আলী আমাদের বলেছিলেন, 'তোমরা বাঙালিরা গর্বিত ও মহাসৌভাগ্যবান যে, শেখ মুজিবের মতো একজন নেতা তোমরা পেয়েছ।'"

কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তিলাভ এবং ভুট্টোর সঙ্গে কথোপকথনের স্মৃতিচারণা শেষে হাবীব আলী আমাদের বলেছিলেন, 'তোমরা বাঙালিরা গর্বিত ও মহাসৌভাগ্যবান যে, শেখ মুজিবের মতো একজন নেতা তোমরা পেয়েছ।' সেদিন হাবীব আলীর স্মৃতিকথা ও মন্তব্য শুনে বিস্মিত হইনি; কিন্তু গর্বে বুক ভরে উঠেছিল। আমরা তো জানতাম আমাদের নেতার ইস্পাতকঠিন দৃঢ় সংকল্পবোধের কথা। যদিও ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ হানাদারমুক্ত হয়েছিল। কিন্তু বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুবিহীন স্বাধীন দেশে বিজয়ের পরিপূর্ণ স্বাদ পায়নি।

মহান মুক্তিযুদ্ধের রক্তঝরা দিনগুলোয় সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল দেশমাতৃকার স্বাধীনতার সূত্রে। জাতীয় ঐক্যের অভূতপূর্ব নিদর্শন ছিল সেই দিনগুলো। ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী-কৃষক-শ্রমিক-যুবক সবাই আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অংশগ্রহণে সফল জনযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করেছি সুমহান বিজয়। আর এখানেই নিহিত আছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মুজিবের ঐতিহাসিক সাফল্য। স্বাধীনতার ডাক দিয়ে একটি নিরস্ত্র জাতিকে তিনি সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। আমরা সেদিন স্লোগান দিয়েছি–'জাগো জাগো বাঙালি জাগো', 'পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'জয় বাংলা' প্রভৃতি। সেদিন কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে বৌদ্ধ, কে খ্রিষ্টান– এসব প্রশ্ন ছিল অবান্তর। আমাদের মূল স্লোগান ছিল 'তুমি কে? আমি কে? বাঙালি, বাঙালি'। আমাদের পরিচয় ছিল 'আমরা সবাই বাঙালি'। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, পাকিস্তানের কারাগার বঙ্গবন্ধুকে আটকে রাখতে পারেনি; মৃত্যুদণ্ড দিয়েও কার্যকর করতে পারেনি। অথচ পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পরাজিত শক্তির দোসর খুনি মোশতাক-রশীদ-ফারুক-ডালিমচক্র বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করল! যে স্বাধীনতাবিরোধীরা মাকে ছেলেহারা, পিতাকে পুত্রহারা, বোনকে স্বামীহারা করেছিল; জেনারেল জিয়া তাদেরকে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করে মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে সংবিধান থেকে উৎপাটন করেছিল। পরাজিত শক্তির পুনরুত্থানে প্রতিমুহূর্তে যে বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছি, তাতে কেবলই মনে হয়েছে–বিজয়ের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, আর পরাজয়ের গ্লানি দীর্ঘস্থায়ী! তথাপি সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশবাসী সাংবিধানিক-গণতান্ত্রিক অধিকার সমুন্নত রেখে, পরাজয়ের গ্লানি থেকে নিজদের অবমুক্ত করে, সব ষড়যন্ত্র ভেদ করে সবল-সমর্থ আর্থসামাজিক বিকাশের দিকে বেগবান গতিতে এগিয়ে চলেছে।

লেখক: আওয়ামী লীগ নেতা; সংসদ সদস্য;
সভাপতি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

নেতা হিসাবে বঙ্গবন্ধু এক এবং অদ্বিতীয়

——ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ; দুর্দান্ত শৈশব, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা কৈশোর, অত্যুজ্জ্বল শিক্ষাজীবন, পেশাগত জীবনে সাফল্যের চূড়ায় আরোহণকারী নিপাট ভদ্রলোক, একই সঙ্গে ভীষণভাবে 'আন্তর্জাতিক' ব্যক্তিত্ব। ন্যায়, সততা, মানবতা ও দেশপ্রেমের পথে নিরঙ্কুশ অভিযাত্রায় নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যক্তি না হওয়া সত্ত্বেও তিনি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেছেন। আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী হিসাবে ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে তিনি ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি পরিচালিত সামাজিক আন্দোলনের অন্যতম একজন সংগঠক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ কারণে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগেও অভিযুক্ত হয়েছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার বিচার এবং মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনায় বাহাত্তরের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতেও তিনি সর্বত্রই সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছেন। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে মিথ্যা মামলায় কারাগারে অন্তরিন করে তৎকালীন ওয়ান-ইলেভেন তথা অগণতান্ত্রিক সরকার। ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ শেখ হাসিনার পক্ষে লড়াই চালিয়ে যান এবং তাঁকে মুক্ত করেন। ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সততা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। আইনমন্ত্রী হিসাবে ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন ও বিচারকার্য শুরু করেন। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের হত্যাকারীদের থেমে যাওয়া বিচারকাজ পুনরায় শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী, অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানবিক মানুষটি সম্প্রতি নিরীক্ষায় একটি সাক্ষাৎকার দেন। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন–**বনশ্রী ডলি**

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রথম দেখা কখন, কীভাবে। তাঁর সঙ্গে কিছু স্মৃতি?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ : ষাটের দশকেই বঙ্গবন্ধুকে প্রথম দেখি। ছাত্রজীবনের প্রথমদিকটায় আমি ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য ছিলাম। পরে বঙ্গবন্ধুর জন্যই মূলত ছাত্রলীগে যোগ দিই। আমাদের

বাসা ছিল ঢাকার পুরানা পল্টনে। সেসময় মাঝেমধ্যে আওয়ামী লীগ অফিসে যেতাম, তখন শেখ মুজিবুর রহমান তুখোড় নেতা। আওয়ামী লীগ অফিসে দেখতাম সবাই তাঁর কথা শুনছে। রাজনৈতিক পরামর্শ এবং সিদ্ধান্তও তাঁর কাছ থেকে আসছে। আমারও ভালো লাগত শুনতে।

তবে ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রথম দেখা ১৯৬৮ সালের দিকে। এর আগে আইন নিয়ে পড়াশোনা করতে ১৯৬৪ সালে চলে যাই লন্ডনে। সেখানে এলএলএম ডিগ্রি ও পরে বার অ্যাট ল (১৯৬৭) ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে আসি। ঢাকায় এসে হাইকোর্ট ডিভিশনে আইনজীবী হিসাবে যোগ দিই। উনসত্তরে যোগ দিই আপিল ডিভিশনে। আইনজীবী হিসাবে কাজ করলেও আন্দোলনে সক্রিয় ছিলাম। সেসময় আন্দোলনের বাইরে থাকা সম্ভব ছিল না আমাদের পক্ষে। প্র্যাকটিস করি; কিন্তু আবার সময় হলে আন্দোলনেও অংশ নিই। কখনো বারে বসেই প্রতিবাদসভা করি।

বঙ্গবন্ধু তখন সত্যিকার অর্থে পাবলিক ইমেজ যাকে বলে বা গ্রহণযোগ্যতা, সবার কাছেই তা গড়ে উঠেছে। তাঁর চেহারা, কথাবার্তা, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডে সবকিছুতেই ফুটে উঠেছে খাঁটি বাঙালি দেশনেতার ব্যক্তিত্ব। দেশপ্রেম ও ত্যাগ-তিতিক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু ছিলেন সত্যিকার অর্থেই দেশনেতা। চেহারা ও চলনবলনে ছিলেন আকর্ষণীয়। তিনি যা বলতেন, সবাই তা শুনতে আগ্রহী হতো।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একটা স্মৃতির কথা বলছি, সময়টা পঞ্চাশের দশক। পুরানা পল্টনে সেগুনবাগিচায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে তাঁর সঙ্গে সরাসরি দেখা করে সহায়তা চাই। স্কুলের জায়গায় সুপ্রভা দেবী নামে এক নারীর বাড়ি ছিল (সুপ্রভা দেবী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন)। তিনি ভারত চলে যাওয়ার পর খালি বাড়িটিতে ছাত্রীদের জন্য একটা স্কুল গড়ে তুলি। কিন্তু এক বিহারি এসে দাবি করেন যে, জায়গাটি তার। তখন কী করি! অনেক ভেবে-চিন্তে এই সমস্যা সমাধানের জন্য ছাত্রীদের নিয়ে সচিবালয়ে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের রুমের সামনে হাজির হলাম। তখন তিনি শিল্পমন্ত্রী, বসেন সচিবালয়ে। রুমের সামনে হইচই শুনে তিনি বললেন, অই, এখানে কী হয়েছে, কারা এসেছে, কী চাস? আমি ছাত্রীদের কয়েকজনকে নিয়ে রুমে ঢুকে বিস্তারিত বললাম, বললাম আপনি একটা কিছু করেন। তিনি সব শুনে বললেন, 'যা, ওদের লেখাপড়া করতে বল, কিছু অসুবিধা হবে না।' সেদিন থেকে সেই স্কুলটি আজও চলছে। এরপর কেউ কখনো এ নিয়ে সমস্যা করেনি। এরপর অনেকবার বঙ্গবন্ধুকে সামনে থেকে দেখেছি বিভিন্ন সময়।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে ভূগোল নিয়ে এবং পরে আইন বিষয়ে লেখাপড়া করেছি। আমাদের ছাত্রজীবনের পুরোটা সময়ই ছিল পাকিস্তান সরকারের কাছে বাঙালি ছাত্র ও সাধারণ মানুষের বিভিন্ন দাবি আদায়ের আন্দোলনে। কারণ, এই বঙ্গের মানুষ ছিল নির্যাতিত আর শোষিত। এভাবেই তো বাংলাদেশ স্বাধীন করার আন্দোলন দানা বাঁধে। অবশ্য তা শুরু হয় ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান ভাগ হওয়ার পরপরই। সাধারণ মানুষ এমনকি অনেক নেতাও এর কুফল বুঝতে না পারলেও শেখ মুজিবুর রহমান বুঝতে পেরেছিলেন–এই রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি বাঙালিকে ঠকানোর ফন্দি। যার বড়ো প্রমাণ উর্দু হবে পূর্ববাংলার রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা। এই বঙ্গের ৫৬ শতাংশ মানুষের ভাষা ছিল বাংলা। জাতিগত ঐতিহ্যে, বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির হাজার বছরের সমৃদ্ধ ভান্ডার বাঙালি লালন করে, ভালোবাসে আর সেসব বন্ধন জড়িয়ে বাঁচতে চায়।

পূর্ববাংলাকে কেবল একটা প্রদেশই বানিয়ে ছিল; কিন্তু এর প্রশাসনিক কাঠামো, রক্ষণাবেক্ষণ সুব্যবস্থা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা–কোনোদিকেই উন্নয়ন করতে চায়নি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার। যে কারণে প্রথমে ছাত্ররা ভাষা আন্দোলন শুরু করে ঢাকায়, পরে তা ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। এটা গণতান্ত্রিক ও যৌক্তিক আন্দোলন ছিল। তখন থেকে আরও পরিষ্কার হয় যে বাঙালির দাবি আদায়ে আন্দোলন ছাড়া, একাট্টা হওয়া ছাড়া সম্ভব নয়। সেদিন বাঙালির জয় হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে তখন থেকেই রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা হিসাবে সামনের সারিতে দেখেছে দেশবাসী এবং বাঙালির কল্যাণে আপসহীন নেতা হিসাবে একটু একটু করে চিনতে শুরু করে। যদিও তখন আওয়ামী লীগ ও রাজনৈতিক নেতা হিসাবে অনেক নেতাই ছিলেন। কিন্তু অসম সাহসী শেখ মুজিব বারবার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় কয়েক বছরে সবাই বুঝতে পেরেছে। সাধারণ মানুষও শেখ মুজিবের প্রতি আস্থা রাখতে শুরু করে।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ করে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে শোষণ করার অগণতান্ত্রিক শাসনের কূটকৌশল প্রথম থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান বুঝতে পেরেছিলেন অন্য নেতাদের আগেই। এটা তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা। কারণ, তিনি ছিলেন আপাদমস্তক এক অসাম্প্রদায়িক ও স্বাধীন মানুষ। যাঁর কাছে প্রথমে মানুষ, পরে তার ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র বিচার। সব স্তরের মানুষের জন্য ছিল তাঁর কল্যাণ ভাবনা। ছাত্রত্ব থাকাকালীন এবং পরে আওয়ামী লীগের নেতা হিসাবে বাঙালির দাবি আদায়ে সব সময় ছিলেন সোচ্চার, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সারাটা জীবন পাকিস্তানের শাসনের শেকল থেকে মুক্তির আন্দোলনের লড়াইয়ে সামনে থেকে জেল-জুলুম, অত্যাচার সহ্য করেছেন তিনি বারবার।

হ্যাঁ, নিজে যেমন তৈরি হয়েছেন, তেমনই বাংলার সাধারণ মানুষকেও দেশেপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছেন। পাকিস্তানের অপমান, অবহেলা ও শোষণ থেকে বাঙালির স্বাধীনতার বিষয়টিকে সামনে এনেছেন। স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগিয়েছেন, তা বাস্তবায়নে লড়াই করেছেন সবাইকে নিয়ে, জাতি হিসাবে বাঙালির পরিচয়কে বিশ্বে তুলে ধরেছেন। একটি গণতান্ত্রিক দেশ ও রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে বিশ্বের স্বীকৃতি আদায় করেছেন বঙ্গবন্ধু। এসব ঘটনায় তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েছি।

১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, বিশেষত্ব কী ছিল?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ: ১৯৬৫ সালে লন্ডন গেলাম পড়তে, পড়া শেষ করে ১৯৬৮ সালে চলে আসি ঢাকায়। আটষট্টিতে অ্যাডভোকেট হিসাবেই আন্দোলন করেছি। ছয় দফার আন্দোলনে ঢাকা সেদিন উত্তাল। আমরাও সেদিন রাস্তায়। সুপ্রিমকোর্টের সামনে থেকেই পুলিশ ধরে নিল, গ্রেফতারও হলাম। হাজতে থাকতে হয়নি, ছেড়ে দেয়

সেদিনই। ছয় দফার দাবিতে আওয়ামী লীগের সক্রিয় আন্দোলন ছিল সব দলকে নিয়ে। যারা এর বিরোধী ছিল, তারা কেবল যোগ দেয়নি। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মীরাও ছিল, যারা বাঙালির শোষণমুক্তি চায়। তারা সারা দেশে আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন ছয় দফার পক্ষে অনঢ়। চুয়ান্ন ও ছাপ্পান্নর নির্বাচন, পাকিস্তান শাসকদের কূটচাল এবং বাষট্টি ও চৌষট্টির আন্দোলনের পর স্বাধীনতা ছাড়া বাঙালির মুক্তির আর কোনো উপায় তো ছিল না। আর ছয় দফা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ।

ছয় দফার জনপ্রিয়তার কারণ কী বলে মনে করেন?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদঃ ছয় দফার জনপ্রিয়তার বড়ো কারণ হলো বাঙালি জাতির স্বীকৃতির প্রশ্ন। দেশে যে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর শাসন, নিপীড়ন, অত্যাচার, তা থেকে মুক্তির সনদ হিসাবে সাধারণ মানুষের কাছে ছয় দফার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষের কাছে সহজ ভাষায় যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পেরেছেন যে এই ছয় দফাই বাঙালিকে পাকিস্তানের অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে পারবে। তাই সাধারণ মানুষও এর প্রতি আস্থা রেখে আন্দোলনে শামিল হয়েছে, যা পরে স্বাধীন হওয়ার রাজনৈতিক সূত্র হিসাবেও গৃহীত হয়। এই মূল সূত্রের সঙ্গে আরও কয়েক দফা যুক্ত হয়ে ১১ দফার আন্দোলন গড়ে উঠে ১৯৬৯ সালে। যার পরিপ্রেক্ষিতে সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ। কিন্তু জয় পেয়েও তো ক্ষমতা হাতে পায়নি বাঙালি বা আওয়ামী লীগ। ক্ষমতা পাওয়ার জন্যও গড়ে উঠে আন্দোলন, তা নিয়েও বঙ্গবন্ধুর ডাকে সারা দেশে আন্দোলনে রাস্তায় নামে বাঙালি।

ভারত-পাকিস্তান দেশবিভাগের বিষয়টি...

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদঃ দেশবিভাগটা ইম্পারেটিভ হওয়ারই কথা ছিল; পিন্ডিতে বসে দেশ শাসন করবে, সেটা হতে পারে না। তখন ছাত্র হলেও আমরা সক্রিয় ছিলাম। আমরা মেজরিটি; কিন্তু তারা চাইছে পাকিস্তানের করাচি থেকে সব করতে। এটা তো বুঝে গিয়েছিল অনেকেই যে, ভাষাভিত্তিক বাঙালি, তারা উর্দুতে কথা বলা মানবে না। সেটাই পরে ১৯৫২ সালে প্রমাণ হলো। সেই ধারাবাহিকতাই তো পরের আন্দোলনগুলো।

১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে যে ভারত-বাংলা ভাগ হলো তা একবারেই উচিত হয়নি। কারণ ধর্মের ভিত্তিতে অগণতান্ত্রিক দেশ কখনো টিকে না। রাজনৈতিকভাবে তা কখনই প্রতিষ্ঠা পায় না, শেষ পর্যন্ত তা-ই তো হলো।

বঙ্গবন্ধু কি অসাম্প্রদায়িক ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য ১১ দফা মেনেই ছয় দফাকে নিয়ে এগিয়েছিলেন?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদঃ তা তো বটেই। ১১ দফায় আরও কিছু দফা ছিল বিস্তৃত। তবে ১১ দফার মূল বিষয় ছিল সমাজতন্ত্র।

সত্তরের নির্বাচনের পরিস্থিতি, আপনাদের ভূমিকা?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদঃ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রায় সব আসনেই তো জয় পেল; কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তা মানতে চায়নি, আলোচনার নামে টালবাহানা, সময়ক্ষেপণ করে। পরিস্থিতি ক্রমেই অশান্ত হয়ে পড়ছিল। আমরা যারা রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় বা আন্দোলনে ছিলাম, তাদের জন্য আরও বেশি অস্থির অবস্থার সৃষ্টি হয়। বাঙালির হাতে দায়িত্ব দিতে কিছুতেই চাইছিল না। কিন্তু বাঙালি তখন ফুঁসে উঠছে। দেশের সবকিছু যেন ভেঙে পড়ার উপক্রম। ঢাকার রাজপথ তখন প্রতিদিনই মিছিল-মিটিং আর প্রতিবাদ স্বাধীনতার ডাক, 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর' স্লোগানে মুখর, অলিগলি আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আইনজীবী হিসাবে সব সময়ই কিছুটা পেছনে থেকে সক্রিয় থেকেছি। সেসময়টাতেও ছিলাম। কোর্ট-বার সবই করতাম; কিন্তু মন তো রাজপথে। তখন আইনজীবী হিসাবে আন্দোলনে গ্রেফতার হওয়াদের ছাড়ানো, জামিন নেওয়ার কাজটি করেছি। আলোচনা ব্যর্থ হলো। জানা হয়ে গেল, একটা যুদ্ধ আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী। বেশ কিছুদিন ধরে গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি তো রাজনৈতিক কর্মীদের চলছিলই।

বঙ্গবন্ধু যখন ৭ মার্চ ভাষণ দেন, সেদিন ছিলাম রেসকোর্স ময়দানে। সামনের সারিতে বসা। আমি ও আমার স্ত্রী আমাদের ছোট্ট ছেলেকে (প্রথম সন্তান) বাসায় রেখে সেদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুপুরের রোদে অপেক্ষা–কখন আসবেন, কী বলবেন, এর পরের পরিস্থিতি কী হবে। এত মানুষ হবে ভাবতেও পারিনি। তবে এটা তো ঠিক যে গণতান্ত্রিকভাবে দেশের জয়ী দলকে শাসনভার তুলে না দিয়ে পাকিস্তান সরকার বাঙালির সঙ্গে অগণতান্ত্রিক আচরণ করছে, যা অন্যায়, হতে পারে না। তা বাঙালি মানবে না।

বলা যায়, সোহরাওয়ার্দীতে সভার পর তো ঠিকই হয়ে গেল। বাঙালি অস্ত্র ধরবে, দেশ স্বাধীন করতে যুদ্ধে জড়াবে। কারণ বঙ্গবন্ধু তো যুদ্ধের ডাকই দিয়েছেন সেদিন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

যুদ্ধে যাবেন সেদিনই ঠিক করলেন?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদঃ তাঁর ভাষণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে যুদ্ধে যেতে। আর আমি তো ছিলাম অনেকটা রাজনৈতিক কর্মীর মতোই। যুদ্ধ করেছি তবে ঢাকায় থেকে অন্যভাবে।

২৫ মার্চ কেমন ছিল পরিস্থিতি? মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস একটু আলোচনা করুন?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদঃ ২৫ মার্চ রাতে বাসায় ছিলাম। নাহ, এত ভয়াবহ হবে আক্রমণ, তা ভাবিনি। আমাদের এলাকাটা অবাঙালি ছিল। তাই খুব একটা গোলাগুলি হয়নি। কিন্তু দূরের বোমার শব্দ পেয়েছি, আগুনের আভাস পেয়েছি আকাশে। ঘরে আলো নিভিয়ে খাটের নিচে শিশু সন্তানকে নিয়ে কোনোরকম রাতটা পার করেছি। এক অন্যরকম রাত। ২৬ তারিখ কারফিউ ছিল, বের হতে পারিনি। ২৭ মার্চ বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, রক্তাক্ত ঢাকা শহর। সারা শহর থমথমে, তখনও লাশ এখানে-ওখানে। মানুষের আতঙ্কিত চেহারা। অনেকে ঢাকা ছাড়ছে।

যুদ্ধে যাওয়ার কথা ভেবেছি। কিন্তু দেশে থেকেই যুদ্ধ করতে হয়েছে। আমাদের বাসাটা ছিল পল্টনে, যেখানে অবাঙালিদের বসবাস ছিল। তাই আমাদের বাসাটা টার্গেট ছিল না পাকিস্তানিদের। আমাদের পল্টন বাসাটা কিছুটা সেফ ছিল। তাই আমাদের বাসাটা মুক্তিযুদ্ধের সহায়তার জন্য কাজ করাটা সুবিধাই হয়েছে। এরপর শুরু হয় আমাদের আসল যুদ্ধ। আমরা তখন কখনো বাসায় থেকে, কখনো অন্য কোথায় লুকিয়ে থেকে কাজ করেছি। যোগাযোগের বিষয়গুলো বিভিন্ন জনের সহায়তায় করতে হয়েছে। অনেকে আমাদের বাসায় থেকে আবার চলেও গেছে। এভাবে নয়টি মাস পার করলাম।

মুক্তিযুদ্ধের বিজয় কীভাবে দেখলেন? সেদিনের অনুভূতি?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদঃ ১৬ ডিসেম্বর। ঢাকা শহরে বাজি ফুটছে। মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছে। বিজয়ের দিন। একটা স্মৃতি আজও মনে

কত মানুষের মৃত্যু আর ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের দেশটা স্বাধীন হলো! তবে তা ছিল অনিবার্য। বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ফিরলেন। সেদিন তাঁকে দেখার জন্য এবং বরণ করার জন্য রওয়ানা দিলাম। রাস্তায় যেতে যেতে বিমানবন্দরের পথে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে কোথায় গিয়ে আটকে দাঁড়িয়েছি, তা খেয়ালই ছিল না

পড়ে। যুদ্ধ শেষ, পাকিস্তানি বাহিনী সেদিনই আত্মসমর্পণ করবে। আর কিছু সময় বাকি। কোর্ট এলাকা ছাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনের দিকটায় গিয়েছিলাম গাড়ি নিয়ে কী একটা কাজে। তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও বাঙালির মধ্যে গোলাগুলির মাঝখানে পড়ে গেলাম। সেদিন মিরাকলি বেঁচে ফিরলাম।

বিজয়ের পরক্ষণেই মনে হয়েছে বঙ্গবন্ধু কোথায়? বেঁচে ফিরবেন তো? তাঁকে ছাড়া এই বিজয় ম্লান, বর্ণহীন।

কত মানুষের মৃত্যু আর ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের দেশটা স্বাধীন হলো! তবে তা ছিল অনিবার্য। বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ফিরলেন। সেদিন তাঁকে দেখার জন্য এবং বরণ করার জন্য রওয়ানা দিলাম। রাস্তায় যেতে যেতে বিমানবন্দরের পথে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে কোথায় গিয়ে আটকে দাঁড়িয়েছি, তা খেয়ালই ছিল না।

স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুকে প্রথম দেখা এবং কোথায়?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ: ঠিক মনে পড়ছে না। তবে কয়েকবারই তো দেখেছি। বিভিন্ন কারণে। তখন একটাই ভাবনা যে, পেশাগত দক্ষতা অর্জন, নতুন দেশ ও দেশের বিচারব্যবস্থাকে গড়ে তোলা। তা অবশ্যই ছিল সম্মিলিত প্রচেষ্টা। সব প্রচেষ্টা আর ব্যবস্থাই তো হোঁচট খেল পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর।

সংবিধানে চার মূলনীতি। এর একটি ধর্মনিরপেক্ষতা, সেটা বদলে ফেলার দরকার ছিল কি?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ: সংবিধানের চার মূলনীতি ঠিক ছিল, যা বঙ্গবন্ধুর সময় করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতা বদলনোর মোটেও দরকার ছিল না। যারা বদলে ফেলেছে, তারা তো আসলে পাকিস্তানে বিশ্বাসী ছিল।

আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে ক্ষমতায়, তারপরও কেন তা ঠিক করা যায়নি?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ: ঠিক করা যায়নি, এর বড়ো কারণ নির্বাচিত সবাই রাজি ছিলেন না। তবে অনেক কিছু আবার আগের মতো করা হয়েছে।

পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ড, কেন এমনটা হলো–আপনার বিশ্লেষণ?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ: ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট, অকল্পনীয় ঘটনা। ঢাকায় ছিলাম। যারা ঘটিয়েছে, তারা তো আসলে অ্যান্টি লিবারেশন, যুদ্ধবিরোধীদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পাকিস্তানে বিশ্বাসী। তারা চেষ্টা করেছে বাংলাদেশকে উলটে ফেলার। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর চার নেতাকেও জেলে হত্যা করা হলো।

২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করলো। আপনি তাঁর মামলায় লড়েছেন, অনেকেই মামলা নিতে বা লড়তে রাজি হলেন না বা সাহস করলেন না, কেন?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ: কেন দাঁড়ালেন না বা প্রস্তাব ফিরিয়ি দিলেন, তা আমরা বলতে পারি না। যা ভাবি, তা বলাটা ঠিক নয় বা বলব না। এটি তাদের ব্যক্তিগত বিষয়। তবে আইনজীবী হিসাবে এই মামলা নৈতিক দায়িত্ব মনে করলাম। বঙ্গবন্ধুকন্যার জন্য লড়তে হবে। আমি মামলা নিতে সাহস করেছি বা মনে করেছি এজন্য যে, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কারণে তাঁকে হয়রানি করা হচ্ছে। যা হবে, এই মামলা আমাকে লড়তে হবে।

মামলা পরিচালনার সঙ্গে ছিলেন আমার জুনিয়ররা, তাদের মধ্যে ব্যারিস্টার তাপস, বর্তমানে ঢাকা দক্ষিণের মেয়র হয়েছেন তিনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় শেখ হাসিনার মামলার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বসাতে হয়েছিল আমার বাসায়। আমার বাসায় এসে প্রশাসনের ব্যক্তিরা এ নিয়ে কথা বলল। আবার গুলশানের এক গোয়েন্দা অফিসে ডাকল। সন্ধ্যায় কোর্ট বসাল। জরুরি ভিত্তিতে কোর্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর বসিয়ে মামলার কাজ করেছি। এটি ছিল একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা ও কমিটমেন্ট নিজের প্রতি, দেশের প্রতি। আইনের জন্য, ন্যায়ের জন্য।

আইনমন্ত্রী হওয়ার প্রসঙ্গে জানতে চাইছি?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ: তখন আমি আর আমার স্ত্রী মাহফুজা খানম ছিলাম ভিয়েতনামে, আমাদের একমাত্র মেয়ের কাছে। তখন ফোন করা হলো দেশে ফেরার জন্য। শেখ হাসিনা কথা বলতে চান। ফিরে এলাম দেশে। এটা ২০০৮ সালের শেষের দিকের কথা। ২০০৮-এর নির্বাচনের আগেই। আলাপ-আলোচনাটা আগেই করে রাখা হয়।

২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি তো মন্ত্রিপরিষদ গঠনই হয়ে গেল। এর আগের কথা বলছি, তো ভিয়েতনাম থেকে দেশে আসার পর গাজীপুরের এমপি রহমতউল্লাহ সাহেব বললেন, ব্যারিস্টার সাহেব, একদিন চলেন শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করতে যাই। ধানমন্ডি-৫-এর 'সুধাসদন'-এ শেখ হাসিনার বাড়িতে আমাকে নিয়ে গেলেন। শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা দুজনেই ছিলেন। আরও ছিলেন তোফায়েল

আহমেদসহ কয়েকজন নেতা। এখানে বলি, শেখ হাসিনা আমাকে মুরুব্বি বলে ডাকেন। তো একপর্যায়ে বললেন, মুরুব্বি রেহানা আপনাকে কী যেন বলবে, কথাটা বলে ভেতরের ঘরে গেলেন শেখ হাসিনা। শেখ রেহানা তখন বলছেন, আপনি আমাদের আইন বিভাগের মানে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিবেন, এটাই আমরা চাইছি। আমি তখন বললাম, আমি তো নির্বাচিত আওয়ামী লীগ নেতা নই। তাছাড়া আমার জায়গায় ভালো আছি, থাকতে চাই। নির্বাচিতদের মন্ত্রী করেন। আইনজীবী হিসাবে যতটা সম্ভব করব। তাঁকে সহায়তা করব। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বভাবসুলভ মতে শেখ হাসিনা ট্রেতে করে খাবার নিয়ে এলেন। শেখ হাসিনাও বললেন, মুরুব্বি শুনলেন তো, আইনের দায়িত্ব নিতে হবে আপনাকে। তাকেও এই প্রস্তাবে অনাগ্রহের কথা জানালাম। শেখ হাসিনার সঙ্গে কথার একপর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেব কি না, দুদিনের সময় চাইলাম।

বাসায় এসে এই প্রস্তাবের কথা বলার পর আমার ভাই ও সন্তানরা খুব একটা রাজি ছিল না। তাদের মতে এভাবেই ভালো, দরকার নেই এমন দায়িত্ব নেওয়ার।

কিন্তু আমার বড়ো ছেলে ডাক্তার মাহফুজ শফিক বলল, আব্বা তুমি কি গাড়িতে মন্ত্রীর পতাকা উড়ানোর জন্য মন্ত্রী হতে চাও? এখানে বলা দরকার, সেই সময়টাতে আমি আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতির বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছি। তাই এই দায়িত্বও আমাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইনের বিভিন্ন ফোরামে কথা বলার জায়গায় নিয়ে গেছে বা পরিচিতি দিয়েছে ইতোমধ্যে। এই দায়িত্ব পালনের অংশ হিসাবে অনেক দেশে সফর করেছি। ওইসব ফোরামে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হওয়া দরকার, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা দরকার, কেন হওয়া দরকার, তা কীভাবে করা হতে পারে, তা বলতাম। দেশগুলো যেন আমাদের সহায়তা করে, সেই দাবিও জানাতাম। কারণ, তা না হলে আইনের শাসন আর গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা পাবে না। তো সেসব কথাই ছেলে মনে করিয়ে দিয়ে বলেছে, এতদিন যে তুমি দেশে দেশে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার চেয়ে এসেছ, এখন তোমার প্রথম দায়িত্ব হলো তা করা। যদি করতে পার তাহলে যাও, দায়িত্ব নাও। জানি, এতে জীবন ও পেশায় ঝুঁকি আছে। তোমাকে আমরা হারাতেও পারি। সেটাও যদি হয়, তাও মেনে নেব; কিন্তু এই দুটি কাজ তোমাকে করতেই হবে।

ভাবনায় পড়লাম, পারব তো? যদি না পারি তাহলে! কারণ, পঁচাত্তরের পর বেশ ক'বছরে সবকিছু বদলে গেছে, বিভিন্ন জটিলতা আটঘাট বেঁধেছে। পরিস্থিতি তখন সবদিক থেকে অনুকূলে ছিল তেমনটা নয়। ভরসা কেবল আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে পরিস্থিতি হয়তো বদলাবে।

দুদিন পর প্রস্তাবে না করে আসব ভেবেছিলাম। ২০০৯ সালের ২ জানুয়ারি সকালে নাশতা খেতে বসে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম কী করব। স্ত্রী মাহফুজা খানম আমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে বললো, দুই ছেলের শর্তও মনে করিয়ে দেন। টানাপোড়েন মন নিয়ে অফিসে গেলাম। মন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাবটি ততক্ষণে অনেকেই জেনে গেছেন। এরই মধ্যে বাসভর্তি আইনজীবীরা বারের সামনে এসে হাজির এবং অফিসে যাওয়ার পর আমাকে ঘিরে রেখেছে, সবাই চায় হ্যাঁ বলি। 'হ্যাঁ' না-বলা পর্যন্ত ওরা আমাকে ছাড়ছে না। তখন দায়িত্ব নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানালাম। তবে শর্ত দিলাম, এক. বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করার জন্য যা করতে হয় তা করতে দিতে হবে এবং দুই. যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজটিও করতে চাই। রাজি হলেন। এরপর তো ৬ জানুয়ারি আইনমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছি।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ১৫ আগস্ট বিচারের বিষয়টিও অনিশ্চিত ছিল, বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা দেশ আছে যে সহযোগিতা বা বিরোধিতা করেছে?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ: বিদেশে যখনই কোনো ফোরামে গিয়েছি অংশ নিতে, সুযোগ পেলেই বিচারের বিষয়টি উত্থাপন করেছি, বিচারের দাবি জানাতাম। কারণ, যে দেশে আইনের শাসন নেই বা থাকবে না, সেদেশে গণতন্ত্র থাকে না, থাকবে না। সে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকে না।

যেখানেই গিয়েছি, যেমন: ইন্ডিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, চীন, আরও কিছু দেশে বিশেষ অধিবেশনে (এত নাম মনে পড়ছে না); বলেছি বিচার হওয়া দরকার। কারণ, তারা অপরাধ করল অথচ অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা যায়নি। আমাদের জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছে। এই জঘন্য অপরাধের বিচার হওয়া দরকার, সে বিষয়গুলোই বোঝাতে চেয়েছি। তাদের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি। তারা সরাসরি সহায়তা করার কথা না বললেও বিরোধিতা করেনি। কিন্তু একবার এক কর্মকর্তা আমাদের সঙ্গে ডিফার করেছে। তিনি বলেছেন, বঙ্গবন্ধু হত্যা এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার এখতিয়ার বাংলাদেশ সরকারের নেই। এই বিচার করা সম্ভব হবে না।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশ ছাড়াও আন্তর্জাতিক ক্ষতি কতটা?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ: গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্যও আন্তর্জাতিকভাবে ক্ষতি। কারণ, যে ব্যক্তি বা যে নেতা গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য এবং শান্তি ও সোহার্দ প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন জেল-জুলুম সহ্য করে সংগ্রাম করেছেন। কোনো বাধাই তাঁকে থামাতে পারেনি, দমিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি সব সময় মানুষকে রাজনীতি-সচেতন করেছেন, দেশপ্রেমিক জাতি হিসাবে গড়ে তোলার কাজ করেছেন। তাঁর নিহত হওয়া বা এই হত্যাকাণ্ড অবশ্যই বাঙালি, বাংলাদেশ এবং সেই সঙ্গে বিশ্বে গণতন্ত্র ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক বড়ো বাধা সৃষ্টি হয়েছে, তা নিশ্চয়ই বলা যায়। ফলে হত্যার পর বিচারের জন্য বাঙালিকে আবার আন্দোলনে নামতে হলো। তিনি নিহত হওয়ার পর যে সংকট তৈরি হয়েছিল, তা থেকে বাঙালি উত্তীর্ণ হয়েছে নানারকম বাধাবিঘ্ন থাকার পরও। কারণ, বিচারের ব্যাপারে ডিটারমিন থেকেছে বাঙালি। বঙ্গবন্ধুর জন্যই তো বাঙালি জাতির সৃষ্টি। জাতির পিতার প্রতি বাঙালির যে অকুণ্ঠ সমর্থন ও উপলব্ধি, সেটাই এই বিচারের পথকে পথ দেখিয়েছে। সে লক্ষ্যেই আমরা কাজ করেছি। জাতির পিতার প্রতি আত্মিক টান আর সমর্থন, ভালোবাসা তা প্রমাণ মিলেছে। শত অপপ্রচার আর বাধার পরও বিচার হওয়া দরকার, বাঙালির উপলব্ধিতে আসতে দেরি হয়নি। বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা, যাঁর হত্যাকাণ্ড কোনো মতেই সমর্থন করেনি গুটিকয়েক মানুষ ছাড়া অন্যসব মানুষ। তাই দেরিতে হলেও এই হত্যার বিচার করা সম্ভব হয়েছে।

ইনডেমনিটি বিল পাশ করা হলো, এর পরের বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ: যারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তারা সত্যিকার অর্থেই তখন রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে। তারা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী, বাংলাদেশের পক্ষে নয়, বাঙালি যে একটা স্বাধীন জাতি বা বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সেটাই স্বীকার করে না। তাই তারা এই বিচারের পথ বন্ধ করে বাঙালিকে জিম্মি করেছে। বঙ্গবন্ধুর শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ভুল বুঝিয়েছে এবং ভীতসন্ত্রস্ত করেছে সর্বত্র। ফলে সংসদে বা প্রশাসনে সব ধরনের অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করে তারা। এত রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতাকে তারা ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছে। জাতির পিতাকে হত্যার

যারা এই অপরাধগুলো করেছে, তা আমাদের দেশের আইনে তো বটেই এবং আন্তর্জাতিক আইনেও অপরাধ বলে স্বীকৃত। আমাদের দেশের আইনেও বিভিন্ন ধরনের প্রমাণ হাজির করতে পেরেছি। প্রথমত, তারা নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে, বাড়িঘরে আগুন দিয়েছে, লুটপাট, ধর্ষণ ও জখম করছে; সেসব অপরাধ আন্তর্জাতিক আইনে অপরাধ বলে স্বীকৃত

বিচার বন্ধ করার জন্য ইনডেমনিটি বিল পাশ করে। এ ধরনের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড, জাতির পিতা ও স্বাধীনতার মহানায়ককে সপরিবারে হত্যার বিচার করতেই হবে। এটা ভাবতে চায়নি অনেকে বা পারেনি রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরিস্থিতির কারণে। তবে এটাও তো ঠিক যে এই হত্যাকাণ্ডের পর প্রকাশ্যে প্রতিবাদ সবাই করতে না পারলেও তা মেনে নেয়নি বাঙালি, কিছুসংখ্যক ছাড়া। তা না হলে এভাবে বিচার করাও সম্ভব হতো না। অনেকটা দেরিতে হলেও বিচার করার পরিবেশ তো সৃষ্টি হয়েছে, বিচার হয়েছে। কারণ বঙ্গবন্ধু বাঙালির মনে অম্লান, অক্ষয় হয়ে আছেন এবং থাকবেন।

বিচারের প্রথম প্রেক্ষাপট, কীভাবে সাহস করলেন?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ: বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের কথা সব সময় বলে আসছি। আনুষ্ঠানিকভাবে শুরুটা কেবল উপযুক্ত সময়ের ব্যাপার ছিল। আইনজীবীরাসহ স্বাধীনতার পক্ষে যাঁরা ছিলেন, সর্বস্তরের মানুষ অত্যন্ত জোরালোভাবে দাবি করেছে। যখন বিদেশে গিয়েছি, তখন সেখানেও ফোরামগুলোয় জোরালোভাবে বিষয়টি তুলে ধরেছি, দাবি জানিয়েছি। ১৯৭৮ থেকেই শুরু করেছি। গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতির হয়ে যখনই বিদেশে গিয়েছি, চীনে গিয়েছি, তখনই বলেছি। যখনই সুযোগ পেয়েছি, তখনই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। যে যেখানে ছিল, সবাই এই দাবি করেছে। বিদেশে অনেকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছে।

কোন বিষয়গুলোকে মূল কারণ নির্ধারণ করে মামলা পরিচালনা করলেন?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ: বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা তো অনেক আগে থেকেই করছিলাম। দেশে তো দীর্ঘদিন এই বিচারের পরিবেশই ছিল না। বঙ্গবন্ধু আর মুক্তিযুদ্ধবিরোধী প্রচার-প্রচারণা চলছিল। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করার প্রথম সভাটা করেছি ঢাকার পুরোনো হাইকোর্ট বিল্ডিংয়ের একটি ঘরে, ১৯৯২ সালের কথা। সেই বিল্ডিংয়েই পরে ট্রাইব্যুনাল বসানো হয়েছে। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের অভিযুক্তরা বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও নিজেরাই স্বীকার করেছে। তা ছাড়াও দেশে-বিদেশে বিভিন্ন এভিডেন্স মানে প্রমাণ রয়েছে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রেও বলা যায়, তাদের অপরাধের প্রমাণ সারা দেশেই ছিল, এখনো রয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও আছে। মামলা দায়ের বা বিচারের জন্য প্রমাণ যথেষ্ট আছে বলেই আমরা পেরেছি। যারা এই অপরাধগুলো করেছে, তা আমাদের দেশের আইনে তো বটেই এবং আন্তর্জাতিক আইনেও অপরাধ বলে স্বীকৃত। আমাদের দেশের আইনেও বিভিন্ন ধরনের প্রমাণ হাজির করতে পেরেছি। প্রথমত, তারা নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে, বাড়িঘরে আগুন দিয়েছে, লুটপাট, ধর্ষণ ও জখম করছে; সেসব অপরাধ আন্তর্জাতিক আইনে অপরাধ বলে স্বীকৃত। তবে কোনো প্রশ্ন যেন না উঠতে পারে, কোনো নিরীহ বা নিরপরাধ ব্যক্তি যেন সাজা না পায়, সেজন্য স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে এসব অপরাধের বিচার হয়েছে আন্তর্জাতিক আইন অনুসরণ করে। আমরা আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেই বিচার করেছি। বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চের গণহত্যার পরও পালিয়ে যাননি। একটা কথা সব সময় বলেছেন, আমরা নির্বাচনে জয় পেয়েছি, ক্ষমতা পাওয়া আমাদের ন্যায্য অধিকার।

পাকিস্তানের বহু সেনা অপরাধী। বলা হয়, তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে–এ প্রসঙ্গে বলবেন?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ: একেবারে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে তা নয়। কথা ছিল পরে তাদের বিচার করা হবে, শর্ত অনুযায়ী তাদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়। কিন্তু পাকিস্তান কথা রাখেনি, বিচার করেনি।

এ ধরনের মামলা ও বিচার করার ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা দরকার বলে মনে করেন?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ: যা করার সংবিধানের নিয়ম মেনেই করতে হবে। যে কোনো অপরাধেরই বিচার হতে হয়। রাজনৈতিক কারণে হত্যাকাণ্ড, রাষ্ট্রবিরোধী কাজ বা অপরাধমূলক কাজ করলে তাকে আইনের আওতায় আনতেই হবে, বিচারও হতে হবে। অপরাধী যত বড়ো প্রভাবশালী ব্যক্তি হোক, যদি সে মুক্তিযোদ্ধা বা ক্ষমতাসীন দলের বা অন্য রাজনৈতিক দলের বড়ো নেতাও হন (যদি অপরাধ প্রমাণ হয়, শাস্তিও নিশ্চিত করাটা সুশাসনের অঙ্গ), আইনের কাছে জবাবদিহি করতেই হবে। আইনের শাসন যদি দেশে প্রতিষ্ঠা করতে হয় আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা থাকলে বা স্থায়ী করতে চাইলে অপরাধীর বিচার হতেই হবে।

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করা সম্ভব বলে মনে করেছেন কখন?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ: একজন বাঙালি ও আইনজীবী হিসাবে সব সময়ই চেয়েছি বিচার হওয়া দরকার। কবে হবে, তা জানতাম না।

সেজন্যই আইনমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাবে সম্মত হতে বঙ্গবন্ধুকন্যা ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আমার শর্তই ছিল, এই হত্যাকাণ্ডের বিচারের জন্য যা যা করা দরকার, আমাকে স্বাধীনভাবে করতে দিতে হবে। তিনি রাজি হওয়ায় আমিও মন্ত্রী হতে সম্মত হয়েছি। আমি তো আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অংশ নিইনি, তাই টেকনোক্রেট মন্ত্রী। আওয়ামী লীগ করি বা করি না, সেটা বিষয় নয়। বিচার শুরু হলো। আমার মন্ত্রিত্ব থাকার সময় ১০ জনের ফাঁসি হলো। অ্যাপিলেট ডিভিশনে যাওয়ার পরও ফাঁসি বহাল থাকে। বাধা আর চ্যালেঞ্জ? পাকিস্তান কিছুটা বাধা সৃষ্টি করেছে। যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষও ছিল বেশ শক্তিশালী। তাই আমাদের অনেক আটঘাট বেঁধে বিচার করতে হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার বাধার বিষয়টি?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ: ঠিক বলেছেন, বাধা তো আসতেই পারে, তা জেনে-বুঝেই এই বিচারের কাজ হাতে নিয়েছি। বিচার চলাকালীন দুর্বৃত্তদের হামলার ও হত্যাচেষ্টার মুখোমুখি হয়েছি কয়েকবার। আমার ইন্দিরা রোডের বাড়িতে, কুমিল্লার বাসায়, গ্রামের বাড়ি নয়নপুরে হামলা হয়েছে, বোমা পড়েছে। একদিনের ঘটনা বলি, কাওরান বাজারের বড়ো রাস্তায় আমার গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছে, আমাকে রক্ষা করতে গিয়ে পুলিশ সদস্যরা গুলিবিদ্ধ হন, রক্তাক্ত হয় রাস্তা। কিন্তু তাতেও আমার তো ভয় পাওয়া বা দমে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

এসব মামলা ও বিচারের কাজে অনেকে আগ্রহও দেখানোর সাহস পায়নি, ভাবেনি যে তা হতে পারে। সুযোগ পাওয়ার পর বিশেষ করে আইনজীবী প্যানেল তৈরি করলাম। অনেকেই ছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ব্যারিস্টার তাপস। তাপসের বাবা-মাকেও বঙ্গবন্ধুকে হত্যার দিনই তাঁদের বাসায় ঢুকে হত্যা করা হয়েছে।

এই মামলা বা বিচারের কাজটি আমার জীবনের বিশেষ ও অন্যতম কাজ। আইনজীবী হিসাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এছাড়াও আছে বিডিআর হত্যাকাণ্ড মামলার বিচার। শেখ হাসিনাকে মিথ্যা মামলা থেকে অব্যাহতি নেওয়ার মামলার কথাও বললেন অনেকে।

হ্যাঁ, দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েকজনের এখনো শাস্তি কার্যকর হয়নি। বিদেশে পালিয়ে আছে, কারও কারও হদিস মিলেছে, তাদের আনার চেষ্টা চলছে। শাস্তি তো হতেই হবে। এসব অপরাধের নেপথ্যের অভিযুক্তদের বিচার করার কথা বলছেন? সে বিষয়টি করা দরকার ছিল; কিন্তু ইটস টু লেট। একটা বিষয় জানবেন, আইনেরও কিছু লিমিটেশন থেকে যায়। এখন বিচার করতে গেলে প্রশ্ন উঠতে পারে এত দেরিতে কেন? তবুও দেশবিরোধী এমন মানসিকতার মূলোৎপাটন করা দরকার। বাংলাদেশের অস্তিত্ব রক্ষায় এসব অপরাধের অপরাধীদের চিহ্নিত করে তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকা এবং সে বিষয়ে তাদেরও উপলব্ধি করানো জরুরি যে তারা যা করেছে তা ক্ষমার অযোগ্য।

এসব বিচার তো অপরাধের বিচার। বিদেশি শক্তি প্রকাশ্যে অপোজ করেনি; কিন্তু সহায়তাও করেনি। ভেতরে ভেতরে বাধা দিতে চেয়েছে বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপে; কিন্তু তা ধোপে টেকেনি। এটা তো সবাই দেখেছে, যখন ট্রায়াল হতো, জামায়াত ও তাদের সমর্থকদের বিচারবিরোধী মিছিল হতো।

বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক আদর্শ ও চেতনার চর্চার কথা বলছি; কিন্তু সংবিধানকে এমন অবস্থায় রেখে তা কতটা সম্ভব?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ: বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ অনেকটাই ঠিক আছে বা চলছে, চেষ্টা চলছে ঠিক পথে চালানোর। তবে একটা কেলামেটিক তো আছেই। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সংবিধানে যুক্ত হওয়া অনেক অসংগতিই আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে কিছু রয়ে গেছে, যা সবাই সম্মতি দেয়নি বলে তখন করা যায়নি। তা ধীরে ধীরে করা যায়। আমরা পারিনি, তখন পরিস্থিতি বিবেচনায় সমর্থনের অভাবে পারা যায়নি। আমি বিশ্বাস করি, এই প্রজন্ম পারবে, তা পারা উচিত। বিষয়টি নিয়ে আপনারা যারা লেখালেখি করেন, তাদের লিখতে হবে। যাঁরা রাজনীতি করেন, তাঁদের সাহস নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আমার তো এখন বয়স হয়েছে, ৮০ বছর। সবটা দায়িত্ব নিয়ে হয়তো পারব না। কিন্তু যতটা সম্ভব সহায়তা করতে পারব বা করব। যদি কেউ সহায়তা নিতে চায়।

বাংলাদেশের বিগত ৫০ বছরে আইনের শাসনের অর্জন কী?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ: আইনের শাসন না থাকলে বাংলাদেশকে টিকিয়ে রাখা যেত না। এটাই বড়ো অর্জন। এছাড়াও বলা যায়, সংসদীয় ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা, বিভিন্ন পর্যায়ের নিয়মিত নির্বাচন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বাতিল করে আবার স্বাভাবিক নির্বাচনে ফেরা সম্ভব হয়েছে আইন ও বিচারব্যবস্থার কল্যাণে। দেরিতে হলেও বঙ্গবন্ধু হত্যা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার–এসব বাংলাদেশের অর্জন বলা যায়।

বর্তমানের মামলাজট, বিচারব্যবস্থা সংস্কার দরকার মনে করেন কি? কোন কাজটা করতে পারেননি বা করা দরকার মনে করেন?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ: করা দরকার অনেক কিছু। সংবিধানের আলোকে করতে হবে। সংবিধানের যেসব অসংগতি রয়ে গেছে, যা দূর করতে পারিনি। যেসব বিষয় মুক্তিযুদ্ধের মৌলিক বিষয়ের পরিপন্থি, সেসব দূর করার জন্য আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে সংবিধানকে ঠিক জায়গায় দাঁড় করানো একটা বড়ো কাজ ভবিষ্যতের সুন্দর বাংলাদেশের জন্য। বঙ্গবন্ধুর পছন্দের বাংলাদেশের জন্য।

বঙ্গবন্ধুকে প্রজন্মের কাছে কীভাবে উপস্থাপন করবেন?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ: তিনি জাতির পিতা, জাতিকে জাতীয়তাবোধ দিয়েছেন। দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলেছেন। এই নেতার কোনো তুলনা হয় না। এক, দুই, তিন বিশেষ অভিধা দিয়ে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

বঙ্গবন্ধুর চেতনা ধারণ করতে পেরেছি কতটা, তাঁকে চর্চা কতটা হচ্ছে বা হয়েছে?

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ: আমার বিশ্বাস, অনেকেই ধারণ করেন, মাঝে কিছু বৈরী সময় পার করে বাঙালি অনেকটাই এগিয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে আরও জানতে, বুঝতে তাঁর লড়াই আর বাঙালির জন্য নিবেদিত সারাজীবনের ত্যাগ এ প্রজন্মকে জানাতে হবে। তাদেরও দায়িত্ব নিয়ে জানতে হবে। না হলে দেশটাকে তারা ভালোবাসবে না। বঙ্গবন্ধু জাতিকে স্বাধীন দেশ দিয়েছেন, জাতীয়তাবোধের মানসিকতা তৈরি করেছেন। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন বাঙালিকে নিজের পরিচয়ে বিশ্বের দরবারে পরিচিত হতে হবে। এর জন্য তিনি সব করেছেন। জীবন দিয়ে তা সফল করে গেছেন। এখন যতটুক হয়েছে, তা এগিয়ে নিতে এ প্রজন্মকে কাজ করতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর বিশেষত্ব কীসে, যা আপনাকে অনুপ্রাণিত করে...

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ: এককথায় চার্মিং পার্সন। তনি যখন দাঁড়াতেন, তখন নীরবতা। ইউনিক কোয়ালিটি। নেতা হিসাবে অদ্বিতীয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা ও দক্ষতা এত বাস্তবসম্মত, যা বিশ্ববাসীর কাছেও বিস্ময় ও সমাদৃত! তাই বঙ্গবন্ধু অমর।

১৬ ডিসেম্বর আনন্দ-বেদনার কাব্য

মুহম্মদ শফিকুর রহমান

১৬ ডিসেম্বর: আনন্দ-বেদনার মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের রচনাকার বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পিতা, ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এর পাতায় পাতায় যেমন রয়েছে বীরত্বগাথা, তেমনই রয়েছে বেদনার কান্নার রোল। মাত্র ৯ মাসে ৩০ লাখ শহিদ আর ৫ লাখ নারীর সম্ভ্রম লুণ্ঠনের অপমান আর যন্ত্রণার কাহিনি। জীবন বাঁচাতে এক কোটি মানুষের দেশান্তরী হওয়ার কথা যেমন আছে, তেমনই আছে দেশের অভ্যন্তরে তিন কোটি মানুষ প্রাণ-মান বাঁচাতে আজ এ বাড়ি তো কাল ও বাড়ি, খাবার নেই, মাথার ওপর এতটুকু ছাদ নেই–কী অবর্ণনীয় কষ্ট। এমনকি ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের দুদিন আগে দেশের ৩১৩ জন বরেণ্য বুদ্ধিজীবীকে বাসা থেকে চোখ বেঁধে বধ্যভূমিতে নিয়ে গুলি আর বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। বর্বর পাকিস্তানি মিলিটারি শাসকরা বুঝতে পেরেছিল পাকিস্তানকে বাঁচাতে পারবে না। বাংলার বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় সহযোদ্ধাদের কাছে তাদের পরাজয় অনিবার্য, তাই বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও যাতে মেধাশূন্য থাকে, সে লক্ষ্যেই দেশের প্রখ্যাত শিক্ষক, সাংবাদিক, লেখক, কবি, বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও শিল্পীদের হত্যা করে। এত কষ্ট, এত ত্যাগের পরও ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি মিলিটারি জান্তার পরাজয় এবং নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ কম আনন্দের নয়। হাজার বছরের বাঙালি জাতির জীবনেও তা একবারই এসেছিল। অনেক কষ্ট-যন্ত্রণার বেদনার মাঝে সেই আনন্দ যেমন কোনোদিন ম্লান হওয়ার নয়, তেমনই কষ্টের কাহিনিও কোনোদিন মুছে যাওয়ার নয়।

॥ দুই ॥

মনে পড়ে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের কথা। প্রফেসর ড. মুনীর চৌধুরী, প্রফেসর ড. জিসি দেব, প্রফেসর ড. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, প্রফেসর ড. আনোয়ার পাশা, প্রফেসর ড. আবুল কালাম আজাদ, প্রফেসর গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, সাংবাদিক শহীদুল্লা

কায়সার, সাংবাদিক খোন্দকার আবু তালেব, সাংবাদিক নিজামুদ্দীন আহমদ, সাংবাদিক এস এ মান্নান (লাডু ভাই), সাংবাদিক আ ন ম গোলাম মোস্তফা, সাংবাদিক এ কে এম শহীদুল্লাহ (শহীদ সাবের), সাংবাদিক আবুল বাশার, শিবসাধন চক্রবর্তী, সাংবাদিক চিশ্‌তী শাহ হেলালুর রহমান, সাংবাদিক মুহম্মদ আখতার, সাংবাদিক সেলিনা পারভীন, ডাক্তার আলীম চৌধুরী, লেখক-চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান, একুশের গানের সুরকার আলতাফ মাহমুদ–এসব বরেণ্য বুদ্ধিজীবীর শূন্যস্থান আজও পূরণ হয়নি। বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকারীরা ছিল বেইমান-মুনাফিক গোলাম আযম, মওলানা মান্নান এবং জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির তথা তৎকালীন ইসলামিক ছাত্র সংঘ দ্বারা গঠিত কিলিং স্কোয়াড আলবদর, আলশামস, বাহিনীর সদস্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আইন পাশ করে বিচারের ব্যবস্থা করলে অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ওই আলবদর-আলশামসদের শীর্ষ কয়েকজনের ফাঁসি হয়েছে। গোলাম আযমের সাজা অবস্থায় মৃত্যু, ফাঁসি কার্যকর হয় মতিউর রহমান নিজামী, সাকা চৌধুরী, মীর কাসেম আলী, কামারুজ্জামান ও আব্দুল কাদের মোল্লার এবং ফাঁসির দণ্ড মাথায় নিয়ে লন্ডন ও নিউইয়র্কে পলাতক চৌধুরী মঈনুদ্দীন ও আশরাফুজ্জামান খান। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের মধ্যে ফাঁসির দণ্ড নিয়ে যারা এখনো আমেরিকা-ব্রিটেনের মতো দেশে পলাতক আছে, তাদেরই মতো মঈনুদ্দীন-আশরাফুজ্জামান পলাতক রয়েছে। ইন্টারপোলের মাধ্যমে তাদের দেশে এনে দণ্ড কার্যকর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তবে ওইসব মানবতার ধ্বজাধারী দেশের সরকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। বলা হচ্ছে, তাদের দেশে ফাঁসির সাজা নেই। এদিকে আরেক যুদ্ধাপরাধী দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী আমরণ কারাভোগ করছে।

॥ তিন ॥

যখন দেখি ইউটিউব এবং তথাকথিত অনলাইন টেলিভিশনে বসে বিশ্বের ১০ জন সফল রাষ্ট্রনেতার অন্যতম এবং তিনজন সৎ সরকারপ্রধানের মধ্যে দ্বিতীয় বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে নোংরা ভাষায় গালাগাল করে, তখন বুঝতে হবে ওরা রাজাকার, আলবদর, আলশামসের উত্তরাধিকার। অনেকগুলোর চেহারা দেখলে মনে হবে, এরা নিকৃষ্ট কোনো গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছে। কথাবার্তায় কুৎসিত অশিক্ষিত তো বটেই, বরং ওদের ধমনিতে যুদ্ধাপরাধীদের রক্ত বইছে। নিউইয়র্ক-কানাডায় বসে এদের পেট্রোনেজ করছে কিছু পলাতক সাংবাদিক, শিক্ষক, সামরিক কর্মকর্তা তাজ হাশমি, মেজর দেলোয়ার, কনক সারোয়ার, ইলিয়াস, সাগর প্রমুখ।

॥ চার ॥

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু একাত্তরের রাষ্ট্রবিরোধী জামায়াত, মুসলিম লীগ, নেজামী ইসলাম পার্টি তথা ধর্মভিত্তিক সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করেছিলেন। একই সঙ্গে মদ-জুয়া, হাউজিসহ তাবৎ অসামাজিক কাজও নিষিদ্ধ করেছিলেন।

দুঃখজনক ঘটনা হলো, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার (দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহেনা বিদেশে থাকায় বেঁচে যান) পর খুনি মিলিটারি জিয়া বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তানি ধারায় নিয়ে যাওয়ার জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত ধর্মভিত্তিক সব রাজনৈতিক দল পুনর্জীবিত করে এবং নাগরিকত্বহারা বা পাকিস্তানি নাগরিক গোলাম আযমদের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিয়ে পাকিস্তানি ধারার রাজনীতি করার সুযোগ করে দেয়। জিয়া একই লক্ষ্যে একই এজেন্ডা নিয়েই ক্ষমতা দখল করেন। ক্ষমতায় বসেই রেডিয়ো-টেলিভিশনে এমনকি সংবাদপত্রেও হুমকি দিয়ে আমাদের রণধ্বনি 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' নিষিদ্ধ করে। পাকিস্তানি আদলে বাংলাদেশ বেতারকে রেডিও বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদকে পাকিস্তানি আদলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার চক্রান্ত শুরু করে। চক্রান্তের মাধ্যমে বিমানবাহিনীকে অফিসারশূন্য করার এবং শত শত সিপাহিকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে।

॥ পাঁচ ॥

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতাকে হত্যার পর একই ধারায় ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে সিরিজ গ্রেনেড হামলা চালিয়ে শেখ হাসিনাসহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র করে। জিয়াপুত্র তারেক রহমানের হাওয়া ভবনে বসে এর পরিকল্পনা করা হয়। মহান আল্লাহর অশেষ কৃপায় একটি গ্রেনেড বিস্ফোরিত না হওয়ায় ট্রাকে দাঁড়ানো শেখ হাসিনাসহ কেন্দ্রীয় নেতারা বেঁচে যান। গ্রেনেডটি পড়ে ট্রাকটির নিচে; কিন্তু বিস্ফোরিত হয়নি। তবে এরপরও খুনির দল থেমে থাকেনি। শেখ হাসিনাকে বহনকারী গাড়িটি লক্ষ্য করে অসংখ্য গুলিবর্ষণ করে। গাড়িটি ছিল বুলেটপ্রুফ। ইউরোপ আওয়ামী লীগ গাড়িটি নেত্রীকে উপহার দিয়েছিল। শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে অন্তত ২১ বার হামলা চালানো হয়। এমনকি ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবনেও হামলা চালানো হয় দুবার। আল্লাহপাক তাঁকে রক্ষা করে চলেছেন বলেই আজ ভয়াবহ করোনার ছোবল বা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ কিংবা তাইওয়ান নিয়ে চীন-আমেরিকার স্নায়ুযুদ্ধ প্রভৃতির কবলে টালমাটাল বিশ্বেও বাংলাদেশ আজও ভালো আছে। বিশ্বব্যাপী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে বিশেষ করে জ্বালানি সংকটে আমাদের দেশেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ কষ্ট পাচ্ছে এটা যেমন ঠিক, এর চেয়েও অধিক সঠিক হলো সরকার সবকিছু মোকাবিলা করে এগিয়ে চলছে, যা বিশ্বের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য কোনো কোনো দ্রব্যমূল্য ৬০ ভাগ বৃদ্ধি করেছে, দেদার কর্মী ছাঁটাই করছে, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে হাউজবিল্ডিং লোনের ইন্টারেস্ট ছিল ৩ শতাংশ, তা এখন হয়েছে সাড়ে ৬ শতাংশ। জ্বালানি তেল, খাদ্যসামগ্রীর দামও বেড়ে গেছে। সে তুলনায় বাংলাদেশে কমই বেড়েছে।

॥ ছয় ॥

বাংলাদেশে এখন কোনো মানুষ না খেয়ে থাকে না। সরকার ভিজিএফ কার্ড, ১০ টাকা কেজিতে মাসে জনপ্রতি ৩০ কেজি চাল, ওএমএস, টিআর-কাবিখার মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রেখেছে এবং বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষকে খাদ্য কেনার সক্ষমতা করে দিচ্ছে।

পাশাপাশি গৌরবের পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ সম্পন্ন এবং চালু করেছেন। চট্টগ্রাম ও ঢাকার অসংখ্য ফ্লাইওভার, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, চট্টগ্রামে কর্ণফুলি টানেলের কাজ সম্পন্ন করে চলেছেন। অন্যান্য শহরেও একইভাবে নির্মাণকাজ চলছে। রূপপুর পরমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, বাঁশখালী বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দরসহ দেশব্যাপী অব্যাহত গতিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ চলছে।

॥ সাত ॥

আমাদের দেশে একটি রাজনৈতিক দল আছে, যার নাম বিএনপি এবং তাদের লেজুর জামায়াত-শিবির রয়েছে, যারা কিছুই দেখে না; কেবল দেখে সংকট। আছেন ওয়ানম্যান পার্টির কিছু নেতা যেমন: মাহমুদুর রহমান মান্না, নুরু, জুনায়েদ সাকি প্রমুখ।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, আমান উল্লাহ আমান, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, শ্যামা ওবায়েদ, ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা এবং আরও এক্স-ওয়াই-জেড প্রতিনিয়ত যেভাবে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও দুর্নীতির কথা

বলে চিৎকার করছেন, টেলিভিশনে বসে চিৎকার করছেন কথা বলার স্বাধীনতা নেই; একে ইংরেজিতে বলে হিপোক্র্যাসি। তবুও এক এক করে এর বিশ্লেষণ দরকার।

গণতন্ত্র: বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া এবং তার ছেলে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান উভয়েই দুর্নীতির দায়ে সাজা খাটছেন। প্রথমজন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বদান্যতায় জেলের বদলে নিজ বাড়িতে এবং দ্বিতীয়জন মুচলেকা দিয়ে বিদেশে পালিয়েছেন–এ দুই নেতা কি কোনো কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আমি জবাব জানি, জিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তখন খালেদা জিয়াকে ভাইস চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয়। একদিন হঠাৎ মেজর জেনারেল মাজেদুল হক এবং কর্নেল জাফর ইমাম সশস্ত্র অবস্থায় বিচারপতি সাত্তারের ধানমন্ডি বাসভবনে উপস্থিত হন এবং অস্ত্রের মুখে বিচারপতি সাত্তারকে তার পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে খালেদা জিয়াকে চেয়ারপারসন হিসাবে ঘোষণা করেন।

এবার আসি এ দলটির মূল ব্যক্তির গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কথায়, তিনি কোন গণতন্ত্রের প্রসেসে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসেছিলেন? এরও জবাব আমার কাছে আছে।

জিয়া ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন, এটা মিথ্যা নয়; কিন্তু তার দল তাকে স্বাধীনতার ঘোষক বানানোর জন্য আজও চেষ্টা করে চলেছে। তবে এখন আওয়াজ ক্ষীণও হয়ে আসছে। মিথ্যা দিয়ে কতদিন চলা যায়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা জীবন মরণপণ সংগ্রাম আর ১৩ বছরের জেলজীবনের পর পাকিস্তানিদের পদানত করিয়ে তবেই স্বাধীনতার ঘোষণা দেন ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বমুহূর্তে:

> জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা জীবন মরণপণ সংগ্রাম আর ১৩ বছরের জেলজীবনের পর পাকিস্তানিদের পদানত করিয়ে তবেই স্বাধীনতার ঘোষণা দেন ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বমুহূর্তে

'This may be my last message, from today Bangladesh is Independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.'

জাতির পিতা এই ঘোষণা আগেই রেকর্ড করে রেখেছিলেন এবং ওই রাত থেকেই বিডিআর বর্তমান বিজিবির ওয়্যারলেসের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান রচিত 'শেখ মুজিব বাংলাদেশের আরেক নাম' গ্রন্থে ১১৭ থেকে ১২৮ পৃষ্ঠায় দালিলিক প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা দেওয়া আছে।

চতুর জিয়া প্রথমে নিজের নামে ঘোষণা করার চেষ্টা করলে চট্টগ্রামের নেতাদের ধমক খেয়ে বঙ্গবন্ধুর নামে ঘোষণাটি পাঠ করেন:

'I, major Ziaur Rahman do here by declare independence of Bangladesh on behalf of our great national leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.'

অথচ জিয়ার মৃত্যুর পর থেকে বিএনপি জিয়াকে ঘোষক বানানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে করে এখন মনে হয় ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। জাতির পিতার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ২৪ বছরের (১৯৪৭-১৯৭১) আন্দোলন বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু ১৩ বছর জেলজীবন এবং অন্তত দুইবার ফাঁসির মঞ্চ থেকে ফিরে এসে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দেন। কে না জানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয় এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুজিবনগর বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়। সেখানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন বঙ্গবন্ধু (পাকিস্তানি কারাগারে বন্দি)। তাঁর অনুপস্থিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। এই জাতীয় নেতাদের পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জিত হয়। বাঙালির এই কালজয়ী মানুষগুলোকেই ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট এবং ৩ নভেম্বর নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আমাদের সংবাদপত্র এবং সচেতন জনগণের উচিত বিএনপিকে প্রশ্ন করা যে ওই মানুষগুলো কি আওয়ামী লীগ নেতা ছিলেন না? তাছাড়া ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার সাংবিধানিক বৈধ এখতিয়ার কেবল বঙ্গবন্ধুরই ছিল এবং বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতে তাঁর নামে ও নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে মুজিবনগর সরকার। জিয়া ছিলেন মুজিবনগর সরকারের অধীনে একজন মুক্তিযোদ্ধা কর্মচারী জেড ফোর্স কমান্ডার। প্রশ্ন করা উচিত– জিয়ার কি স্বাধীনতা ঘোষণার সাংবিধানিক এখতিয়ার ছিল? এসব তথ্য অন্তত হাজারবার লেখা হয়েছে, বলা হয়েছে।

॥ আট ॥

মানবাধিকার: বিএনপি নামক এই দলটির প্রতিষ্ঠাতা জিয়া জাতির পিতার খুনের সঙ্গে জড়িত। সেই দলের নেতারা যদি মানবাধিকারের কথা বলে, তাহলে পুরান ঢাকার ঘোড়াও হাসবে। বরং জিয়াপত্নী খালেদা জিয়া (দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত) ১৫ আগস্ট নিজের ভুয়া জন্মদিন বানিয়ে ৫০-৭০ কেজির কেক কেটে বঙ্গবন্ধুর প্রতি পরিহাস করেছেন দীর্ঘদিন। সাম্প্রতিককালে মনে হয় বোধোদয় হয়েছে। তারপরও কিছু আনাড়ি সমর্থক আছে এখনো সেই ভুয়া জন্মদিন উদ্‌যাপন করছে আড়ালে-আবডালে। সাংবাদিক তথা বুদ্ধিজীবীদের প্রশ্ন করা উচিত– ওইসব বর্বর হত্যাকাণ্ড কি মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়? ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর ক্যুর নামে বিমানবাহিনীকে অফিসারশূন্য করা বা শত শত জওয়ানকে ফাঁসিতে ঝোলানো কোন মানবাধিকার?

॥ নয় ॥

অর্থনীতি: বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ; কিন্তু এখানে জমির মালিকানায় কোনো সমতা নেই। একজনের হয়তো শত বিঘা রয়েছে আবার

অনেকের এক বিঘাও নেই। এসব চিন্তা করে বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাদ এবং ফসলের ভাগাভাগির পদক্ষেপ নেন। এর জন্য জাতীয় সরকার দরকার, তাই তিনি আওয়ামী লীগসহ সব রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম স্থগিত করে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে জাতীয় দল ও সরকার গঠন করেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সব দলের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের সদস্যরা বাকশালের সদস্য। জিয়াও বাকশালে যোগ দিয়েছিলেন।

অথচ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর সেই অর্থনৈতিক কর্মসূচি বাতিল করে দেওয়া হয়। বহুমুখী গ্রাম সমবায়টি যদি বাস্তবায়ন করা যেত, তাহলে অনেক আগেই বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের স্তর পেরিয়ে উন্নত অর্থনীতির দেশের দিকে এগিয়ে যেত। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে দেশটাকে ৫০ বছর পিছিয়ে দেওয়া হলো। আল্লাহপাকের শুকরিয়া যে শেখ হাসিনাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন বলেই এবং জনগণ তাঁর হাতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব দেওয়ায় আজ বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ তথা উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত হয়ে উন্নত দেশের দিকে এগিয়ে চলেছে। আগেই বলেছি, আমরা আরও অনেকটুকু এগিয়ে যেতে পারতাম যদি না কোভিড-১৯ বা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ অথবা তাইওয়ান নিয়ে চীন-আমেরিকার স্নায়ুযুদ্ধ বিশ্বকে রাজনৈতিকভাবে বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে লন্ডভন্ড করত। কী যে ক্ষতি বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশেরও হয়েছে, তা কেবল সংবেদনশীল মানুষইও বুঝতে পারবেন। মির্জা ফখরুলের দল মনে-প্রাণেই সহিংস এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ, যে কারণে জাতি তাদের কাছে কিছু আশা করে না।

॥ দশ ॥

রাজনীতি: সামরিক শাসকদের রাজনীতি যতটুকু এ জীবনে জেনেছি, দেখেছি, তাতে যা সামনে এসেছে তা হলো প্রথমে ক্যু করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা। দেশবাসীর কাছে অঙ্গীকার করে এই বলে যে দেশ উচ্ছন্নে যাচ্ছিল তাই দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করতে বাধ্য হয়েছে। আমরা অল্পদিনের মধ্যেই সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে চলে যাব। ওই অল্পদিন আর শেষ হয় না। তাছাড়া কত বড়ো হিপোক্রেসি–ক্যুর মাধ্যমে যাদের ক্ষমতাচ্যুত করা হয়, তারা তো জনপ্রতিনিধি ছিল। আসলে সব ভাঁওতাবাজি। সেই পাকিস্তান আমল থেকে আমরা দেখে আসছি। প্রথমে ক্যুর মাধ্যমে ক্ষমতার দখল, তারপর কিছুদিন মার্শাল ল চালিয়ে লুটপাট করে পেট ভরিয়ে প্রশাসনের প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে বৈধতা নিয়ে আর 'অল্পদিনের' নামটিও নেয় না। বরং সমাজের নানা স্তর থেকে লোক ধরে ধরে এনে প্রথমে একটা পলিটিক্যাল জোট গঠন করে। আইয়ুব-ইয়াহিয়া থেকে শুরু করে জিয়া-এরশাদ সবই একই পাড়ার বাসিন্দা এবং একই ধারার পথিক। আইয়ুব মৌলিক গণতন্ত্র নাম দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের টাউট চেয়ারম্যান-মেম্বারদের ভোটার বানিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে। এ প্রশ্নে দৈনিক ইত্তেফাকের একটি শিরোনাম ছিল খুব মজার। ষাটের দশকে আইয়ুবের মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচন সামনে। ফরিদপুরে এক খোদাই ষাঁড় (যে ষাঁড় লাওয়ারিশ হিসাবে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া) রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তার সামনে পড়ে এক মৌলিক গণতান্ত্রিক বা ইউপি মেম্বার। খোদাই ষাঁড়টিকে নিরীহ মনে করে তাকে তাড়াতে গেলে সে মৌলিক গণতন্ত্রের পেটে গুঁতা মারে এবং গুঁতা এত জোরে ছিল যে ষাঁড়ের একটি শিং ভদ্রলোকের পেটে ঢুকে যায়, তাতে ওই মৌলিক গণতন্ত্রী বা মেম্বার সাহেব মারা যায়। খবরটি দৈনিক ইত্তেফাকে এলে তখন ইত্তেফাকের নিউজ অ্যান্ড এক্সিকিউটিভ এডিটর শহিদ সিরাজুদ্দীন হোসেন ওই নিউজের শিরোনাম করেন: 'চিনিল ক্যামনে?'

জিয়াও কম যাননি। ক্ষমতা দখল করে তিনি আইন করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার বন্ধ করেন। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল জামায়াত-শিবির, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী পার্টি পুনরায় উজ্জীবিত করে তাদের রাজনীতির অঙ্গনে ফ্রি ছেড়ে দেন। একই সঙ্গে নিষিদ্ধ গোষ্ঠী, মদ-জুয়া. হাউজি পুনরায় চালু করেন। সেসময় লাকি খানের ডান্স যুবসমাজকে আকৃষ্ট করে। গোলাম আযম, শাহ আজিজদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আবার বাঙালি জাতির কাঁধে পাকিস্তানি ভূত চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। তারা পুরোদমে রাজনীতি শুরু করে। শাহ আজিজুর রহমান জিয়াউর রহমানের সঙ্গে যোগ দেয় এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও পর্যন্ত হয়। গোলাম আযম বিএনপির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেও আলাদাভাবে দল গোছাতে শুরু করে। এবং এরাই বেশকিছু জঙ্গি সংগঠন গড়ে তোলে। যেমন: হিজবুল মুজাহিদিন, আল্লার দল, আনসার উল্লাহ বাংলা টিম, হিযবুত তাহরির। জঙ্গিরা রাজশাহীতে সশস্ত্র হয়ে প্রকাশ্যে মিছিল পর্যন্ত করে। ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে শত শত পেট্রোল বোমা মেরে মানুষ হত্যা করে। একসঙ্গে দেশের ৬৩ জেলার ৫০০ পয়েন্টে বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাদের শক্তি জানান দেয়। সব কথার শেষ কথা হলো, জিয়াই ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তান বানানোর জন্য জঙ্গির উত্থান ঘটায়। বস্তুত জিয়া মুক্তিযুদ্ধের জন্য সীমান্ত অতিক্রম করলেও কোনো একটি বড়ো যুদ্ধ করেছেন–এমন কোনো গ্রন্থে দেখা যায় না।

॥ এগারো ॥

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আরেকটি রক্তাক্ত দিন। আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে। সেদিন ছিল বিএনপির সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ মিছিল। মিছিল বের হবে ২৩ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনের চত্বর থেকে। যথারীতি চত্বর মানুষে মানুষে ভরে চারদিকে উপচে পড়ছিল। আওয়ামী লীগ ও তখনকার বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সব কেন্দ্রীয় নেতাসহ অস্থায়ী মঞ্চ হিসাবে একটি ট্রাকে উঠেন এবং মিছিলপূর্ব বক্তৃতা শেষে মিছিল শুরু করবেন, ঠিক এ সময় একটার পর একটা গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের চত্বরে মৃতদেহ রক্তের ওপর ভাসতে থাকে। অন দ্য স্পট কেন্দ্রীয় নেত্রী আইভি রহমানসহ ২৪ জনের প্রাণহানি এবং বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতাসহ তিন শতাধিক আহত হন। জানা যায়, ১৩টি গ্রেনেড ছোড়া হয়েছিল এবং যে গ্রেনেডটি নেত্রীকে বহনকারী ট্রাকের নিচে পড়েছিল, সেটি বিস্ফোরিত হয়নি। যে কারণে শেখ হাসিনাসহ ট্রাকের ওপর নেতারা বেঁচে যান। নেতারা নেত্রীকে ঘিরে মানবপ্রাচীর রচনা করেন। এটি সম্ভবত আল্লাহপাকের ইশারা। আল্লাহ নেত্রীকে বাঁচিয়ে রাখবেন মানুষের সেবায়। তারপরও আবদুর রাজ্জাক, মেয়র মোহাম্মদ হানিফ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের শরীরে গ্রেনেডের স্প্লিন্টার বের করতে না পারায় পরবর্তী সময়ে তারা মারা যান। এখনো অনেকে এই স্প্লিন্টারের যন্ত্রণা নিয়ে পঙ্গুত্বের জীবনযাপন করছেন। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, তখনকার সরকারপ্রধান খালেদা জিয়া এর বিচার তো করেননিই বরং জজ মিয়া নাটক সাজিয়ে ঘটনা ভিন্নভাবে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেন। এক বিচারপতি জয়নুল আবেদিনকে দিয়ে ওয়ান ম্যান তদন্ত কমিশন করা হয়। ওই বিচারপতি রিপোর্ট দেন পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে এসে ঘটনা ঘটানো হয়েছে। ইঙ্গিতটি ভারতের দিকে। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার ছিল, খালেদা জিয়া ও তার আনাড়ি কয়েকজন এমপি সংসদে বললেন শেখ হাসিনা ভ্যানেটি ব্যাগে করে গ্রেনেড নিয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সংসদনেতার আসনে বসা খালেদা অট্টহাসি দিয়ে টেবিল চাপড়িয়ে তাদের উৎসাহ দেন।

তবে সবকিছু ফাঁস করে দেয় কোটালীপাড়ায় ৭৬ কেজি দুইটি শক্তিশালী মাইন পুঁতে শেখ হাসিনাকে হত্যা প্রচেষ্টার হোতা মুফতি

হান্নান। আসল সত্য প্রকাশ করে দেয় যে তারেক রহমানসহ হাওয়া ভবনে বসে এই গ্রেনেড হামলার পরিকল্পনা করা হয়। তৎকালীন ছাত্রদলের নেতার ভাই মাওলানা তাজউদ্দিন পাকিস্তান থেকে ওই আরজেস গ্রেনেড এনে সরবরাহ করে। এমনকি গ্রেনেড হামলার পর খালেদা জিয়া-বাবরের পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুড়ে গোটা এলাকা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে দেয় যাতে হামলাকারীরা সহজে পালাতে পারে।

॥ বারো ॥

সাম্প্রতিককালে তারেক-ফখরুলরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে নানা কটূক্তি করে চলেছে। দণ্ড মাথায় নিয়ে মুচলেকা দিয়ে পালিয়ে লন্ডনে বসে অনলাইন টিভিতে ভিডিয়ো বানিয়ে প্রচার করে চলেছে দিনের পর দিন। বিকৃত মানসিকতা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করছে এবং মাননীয় নেত্রী সম্পর্কে যা-তা বলে চলেছে। ইদানীং একটা ঘোষণা দিয়েছিল '১০ ডিসেম্বর ঢাকায় সমাবেশের পর দেশ চালাবে খালেদা জিয়া!' বাংলাদেশের মানুষ এতদিন শুনে আসছে খালেদা জিয়া অসুস্থ। তার এমন অবস্থা যে, বিদেশে চিকিৎসা না করালে তাকে বাঁচানো যাবে না। কত আন্দোলন, কত বিক্ষোভ মিছিল। অথচ তাকে বিদেশে চিকিৎসাও করানো হলো না, তিনি দেশ চালাবেন! তাছাড়া তিনি তো দুর্নীতির মামলায় সাজাপ্রাপ্ত। তিনি কীভাবে দেশ চালাবেন? আর তারেক তো দণ্ড মাথায় নিয়ে বিদেশে পলাতক। সেই বা কীভাবে দেশ চালাবে!

॥ তেরো ॥

তবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ডিসেম্বর তো আমাদের বিজয়ের মাস। বিএনপি-জামায়াতের নয়। তাদের আত্মসমর্পণের মাস। বস্তুত তাই তারা ডিসেম্বর নিয়ে গর্ব করতে পারবে না। কারণ, তারা তাদের প্রভু পাকিস্তানি জেনারেলসহ ৯৩ হাজার সেনা আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আত্মসমর্পণকারীর কোনো মানসম্মান থাকে না। এ সত্যটি মির্জা ফখরুলরা বুঝতে পারেন না। তবে অবাক হতে হয় যখন দেখি ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানার মতো নারী বা কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক তথা শিক্ষিত লেখাপড়া জানা লোক তারেকের মতো লোককে বিএনপি নেতা হিসাবে গর্ব করে।

॥ চৌদ্দ ॥

আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় বাংলাদেশের সুনাগরিক হতে হলে জাতির পিতাকে জানতে হবে। তাঁর ১৯৪৭ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হয়ে ঢাকায় ফিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল বিভাগে ভর্তি এবং বাংলা ভাষা আন্দোলন, আটচল্লিশে ছাত্রলীগ এবং উনপঞ্চাশে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা, বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী আন্দোলন এবং এর জন্য তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার, চুয়ান্নর ২১ দফার নির্বাচন ও জয়লাভ, দল সংগঠনে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ, আটান্নর আইয়ুববিরোধী আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন ও গোপন সংগঠন স্বাধীনতার নিউক্লিয়াস স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ গঠন, ছেষট্টির ছয় দফা এবং আগরতলা রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলা ও হত্যা চক্রান্ত, উনসত্তরের ফেব্রুয়ারিতে কারামুক্তির পর জাতির পক্ষ থেকে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে ১০ লক্ষাধিক মানুষের করতালির মধ্যে বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান, একাত্তরের ৩ জানুয়ারি পল্টনে ছাত্রলীগের সমাবেশে বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা ঘোষণা, ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমেদ কর্তৃক বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান, একই বছর মার্চে দুনিয়া কাঁপানো অসহযোগ আন্দোলন, ঐতিহাসিক রেসকোর্স বা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কালজয়ী ৭ মার্চের ভাষণ ও স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা, ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ও গেরিলা পদ্ধতিতে মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশ, পাকিস্তানের হাতে গ্রেফতার ও সেখানকার লায়ালপুর কারাগারে আটক এবং দুইবার ফাঁসির আদেশ প্রদান কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা ও মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে মিত্রবাহিনী হিসাবে ভারতীয় বাহিনীর অংশগ্রহণ, গণহত্যার অবসান ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য মিসেস গান্ধীর ৩৭ দেশভ্রমণ ও জনমত গঠন, পরিশেষে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ এবং ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজয়বরণ ও আত্মসমর্পণে বাধ্য করার মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন।

॥ পনেরো ॥

এই গেল একদিক, আরেকদিক হলো স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন, অল্প সময়ে বিশ্বের অন্যতম সেরা সংবিধান প্রণয়ন, ১৯৭৩-এর সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে তেয়াত্তরের নির্বাচন ও সংবিধান অনুমোদন, বিদেশের চক্রান্তে একটি দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করে দেশকে স্বল্পোন্নত দেশে রূপান্তর। তারপর চরম ট্র্যাজেডি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার শত্রুদের হাতে সপরিবারে জাতির পিতার হত্যাকাণ্ড, জাতীয় চার নেতার হত্যা বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তান বানানোর চক্রান্ত।

আরেকদিক হলো, ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান এবং জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা দলের এবং দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করায় বাংলাদেশ বিশ্বের বিস্ময় মধ্যম আয়ের উন্নয়নশীল দেশ। এরপর আর বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই।

॥ ষোলো ॥

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যার কিছু বিবরণ পাওয়া যায় আমেরিকান কবি এলেন গিন্সবার্গের কবিতা 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড'-এ:

'Millions of babies watching the skies
Bellies swollen, with big round eyes
On Jessore Road--long bamboo huts
Noplace to shit but sand channel ruts

Millions of fathers in rain
Millions of mothers in pain
Millions of brothers in woe
Millions of sisters nowhere to go...'

আমেরিকান কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে পশ্চিম বাংলা থেকে যশোর রোড দিয়ে বাংলাদেশে আসার চেষ্টা করেন। পথে পথে রিফিওজির সারি এবং যশোর রোডের দুপাশে ঝুপড়িতে বসবাসকারী মানুষের কষ্ট দেখে কবিতাটি লেখেন 'September on Jessore Road'.

গিন্সবার্গ কবিতাটি প্রথম আবৃত্তি করেন জর্জেস ইপিসকোপলে চার্চে একটি আবৃত্তি প্রোগ্রামে। পরে ঐতিহাসিক বাংলাদেশ কনসার্টে সুর দিয়ে গানটি সংগীতজ্ঞ বব ডিলন পরিবেশন করেন, যে কনসার্টের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন পণ্ডিত রবিশংকর। এরপরও যদি কেউ না দেখে সে অন্ধ। এ কারণে আমি শিরোনাম দিয়েছি:

'১৬ ডিসেম্বর আনন্দ-বেদনার কাব্য'
'যেন ভুলে না যাই'

ঢাকা, ২৪ নভেম্বর ২০২২

লেখক: সংসদ সদস্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রধান সম্পাদক, দৈনিক পথে প্রান্তরে

তেলিয়াপাড়ার যুদ্ধ ॥ মৃত্যুকে কাছ থেকে দেখা

মেজর জেনারেল (অব.) সুবিদ আলী ভূঁইয়া

কুমিরার যুদ্ধের পর আমি কালুরঘাটস্থ বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হই। ৩০ মার্চ বেতার কেন্দ্রটি পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ধ্বংসের পর আমি রামগড় দিয়ে সাব্রুম হয়ে আগরতলায় পৌঁছি। সেখানে ৩নং সেক্টরের অধীনে বিভিন্ন অপারেশনে অংশ নিই। তেলিয়াপাড়ার লড়াই তেমনই একটি অধ্যায়। পাঠকের সামনে সেই লড়াইয়ের অংশবিশেষ তুলে ধরছি।

২৫ এপ্রিল ১৯৭১। আমি তখন সিলেটের তেলিয়াপাড়ায়। তেলিয়াপাড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন। স্টেশনটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেটের মধ্যে রেল ও সড়কপথে সংযোগস্থল। ২৭ এপ্রিল আমি তেলিয়াপাড়ায় নতুন করে দায়িত্ব নিই। সেখানে আমি ও ক্যাপ্টেন মতিন যৌথভাবে কাজ করি। আমাদের অধীনে প্রায় ৭০ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের (ইপিআর)। এছাড়াও কিছুসংখ্যক ছিলেন মুজাহিদ বাহিনীর। তেলিয়াপাড়ায় শত্রুবাহিনীর সঙ্গে আমাদের তুমুল লড়াই হয়।

আমরা তেলিয়াপাড়ায় প্রতিরক্ষাব্যবস্থা নেওয়ার প্রথম দিনেই শত্রুরা আমাদের ওপর আক্রমণ চালায় এবং এই লড়াইয়ের পর তেলিয়াপাড়া দখল করে নেয়। এই আক্রমণটা ছিল অত্যন্ত আকস্মিক। যুদ্ধের 'ট্যাকনিক্যাল' দিকটা বিচার করলে আক্রমণের সময় যে বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি আমাদের লক্ষ রাখতে হয়, তাদের মধ্যে একটি হলো অতর্কিত আক্রমণ। এই অতর্কিত আক্রমণের কারণেই আমরা পিছু হটতে বাধ্য হই। কিন্তু শত্রুরা তেলিয়াপাড়া দখল করার পরমুহূর্তেই আমরা খুব অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে পালটা আক্রমণ চালাই এবং হারানো জায়গা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হই। তেলিয়াপাড়া থেকে যখন আমরা পিছু হটতে বাধ্য হই, তখন আমাদের জওয়ানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। কিন্তু এই ছত্রভঙ্গ অবস্থায়ই আমরা যখন পালটা আক্রমণ চালাই, শত্রু তখন পিছু হটতে বাধ্য হয়। পালটা আক্রমণের সময় মেজর মতিনের সঙ্গে যে দলটি ছিল, তাঁরা উচ্চৈঃস্বরে 'জয়

সেই প্রচণ্ড লড়াইয়ের ভেতর কোনো যোগাযোগব্যবস্থা না থাকায় মনে হতো সবাই যেন পজিশন ছেড়ে চলে গেছে, কখনো কখনো মনে হয় আমি একাই যেন সেখানে পজিশন নিয়ে আছি। সেই প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে আদৌ বোঝা সম্ভব ছিল না কে কোথায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে

বাংলা' স্লোগান দিয়ে ফায়ার করতে করতে অগ্রসর হওয়ার সময় শত্রুবাহিনী অনেকটা ঘাবড়ে যায়। যদিও জওয়ানদের সংখ্যা কম ছিল, তবুও স্লোগানের আওয়াজে মনে হচ্ছিল যেন আমরা সংখ্যায় অনেক। এখানে আরেকটা কথা উল্লেখ না করে পারছি না, পালটা আক্রমণের সময় আমরা মর্টারের সাহায্য নিয়েছিলাম। মর্টার ছিল মাত্র একটি; কিন্তু তাতে আবার সাইট ছিল না। বিনা সাইটে মর্টারের গোলা যেভাবে কার্যকরী হয়েছিল, তা সত্যিই ভোলার নয়। সাইট না থাকায় আমাকে অনেকটা আন্দাজের ওপরই গোলা নিক্ষেপ করার আদেশ দিতে হয়েছিল। শত্রুবাহিনী তেলিয়াপাড়া দখল করার পর যেখানে একত্রিত হয়েছিল, ঠিক সেখানেই গোলাগুলো পড়ে। গোলা এত সঠিকভাবে শত্রুবাহিনীর ওপর পড়বে, এ ছিল আমাদের কল্পনারও বাইরে।

তেলিয়াপাড়া পুনরুদ্ধারের পর শত্রুবাহিনী বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এমনকি সেসময় তারা আমাদের ওপর দিনে দুবার আক্রমণ করে। কিন্তু প্রতিবারই আমাদের জওয়ানরা শত্রুবাহিনীর আক্রমণের পালটা জবাব দেয়। কয়েকদিন লড়াই চলার পর আরও কিছুসংখ্যক লোক পাঠিয়ে আমাদের শক্তি আরও বৃদ্ধি করা হয়।

তেলিয়াপাড়ায় অবস্থানকালে আমাদের নানা অসুবিধার ভেতর দিন কাটছিল। খাওয়াদাওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। একনাগাড়ে পাঁচদিনের মতো আমরা ঠিকমতো কোনো খাবারই পাইনি। তাছাড়া খাবার যাও পাওয়া যেত, তা কখনো নিশ্চিন্তে খাওয়ার উপায় ছিল না। শত্রুপক্ষ ঠিক খাওয়ার সময় আমাদের ওপর কামানের গোলাবর্ষণ শুরু করত। কোনো কোনোদিন ঠিক খাওয়ার সময়ই আমাদের ওপর আক্রমণ চালানো হতো। এ অবস্থায় আমরা কাঁচা কাঁঠাল এবং আধা পাকা লিচু খেয়েই দিনের পর দিন কাটিয়ে দিই। সেসময় কয়েকদিন প্রবল বৃষ্টিও হয়েছিল। বৃষ্টির পানিতে আমাদের ট্রেঞ্চগুলো ভরাট হয়ে যায়। রাতে শত্রুর আক্রমণের সময় সেসব পানিভর্তি পরিখায় অবস্থান নিয়েই আমাদেরকে তাদের মোকাবিলা করতে হতো। আমার স্পষ্ট মনে আছে, একসময় আমি এবং আমার রানার প্রায় আড়াই ঘণ্টা পানিভর্তি পরিখায় ছিলাম। আমাদের হাতে ওই সময় কোনো ম্যাপ ছিল না। ছিল না কোনো দুরবিন, কম্পাস। বলতে গেলে আমাদের হাতে তখন থ্রি নট থ্রি রাইফেল এবং কতগুলো এলএমজি ছাড়া আর কিছু না। অবশ্য দুটি মর্টার ছিল, যার কোনো সাইট ছিল না। এ সময় শত্রুরা রাতদিন কামান থেকে গোলাবর্ষণ করত। এই শেলিংয়ের কারণে আমাদের কয়েকজন সৈনিক ওই সময়ে শাহাদতবরণ করেন। একদিন শত্রুপক্ষের একটি আর্টিলারি শেল এসে তেলিয়াপাড়া চা-বাগানের ডাকবাংলোর সামনে পড়ে। তাতে বটগাছের নিচে অবস্থানরত আমাদের পাঁচজন ছাত্র শহিদ হন এবং ওইখানেই সেই পাঁচজন বীর তরুণকে সমাহিত করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে আমার এবং ক্যাপ্টেন মতিনের মধ্যে তখন প্রায়ই যোগাযোগ থাকত না। যুদ্ধক্ষেত্রে বেতার যোগাযোগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বেতার যোগাযোগ দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে কমান্ড এবং কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই প্রচণ্ড লড়াইয়ের ভেতর কোনো যোগাযোগব্যবস্থা না থাকায় মনে হতো সবাই যেন পজিশন ছেড়ে চলে গেছে, কখনো কখনো মনে হয় আমি একাই যেন সেখানে পজিশন নিয়ে আছি। সেই প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে আদৌ বোঝা সম্ভব ছিল না কে কোথায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে। একমাত্র সৃষ্টিকর্তার ওপর ভরসা করে নিজের অবস্থানে বসে থাকতাম। প্রাণপণে মোকাবিলা করে যেতাম শত্রুকে। আমাদের সঙ্গে যেসব ইপিআর, মুজাহিদ ও ছাত্র সংগ্রামীরা ছিল, তাঁরা সবাই শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। তেলিয়াপাড়ার যুদ্ধে মুজাহিদ দুলা মিয়া যে সাহস ও মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে লড়াই করেছিল, তাঁর কথা আজও মনে পড়ে।

কুমিল্লার সালদা নদীর কাছে দুলা মিয়ার বাড়ি। লড়াইয়ে তাঁর অসীম সাহস দেখে ক্যাপ্টেন মতিন তাঁকে একটি সেকশনের নেতৃত্বের ভার দেন। বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্য এই অকুতোভয় দুলা মিয়া এবং আরেকজন দুঃসাহসী ছেলে (তাঁর নাম এখন মনে পড়ছে না) মেজর সফিউল্লাহর কাছ থেকে ২৫ টাকা করে পুরস্কার পেয়েছিলেন। দুঃসাহসী মুজাহিদ দুলা মিয়া পরে সিলেটের মুকুন্দপুরের লড়াইয়ে শত্রুর হালকা মেশিনগানের গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হন। কয়েকটি গুলি তাঁর পেটে এসে লাগে। কিন্তু আহত হওয়া সত্ত্বেও দুলা মিয়া তাঁর জায়গা ছেড়ে পিছু হটেনি। একইভাবে সে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। মারাত্মক আহত অবস্থায় পরে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

তেলিয়াপাড়ায় লড়াই করার সময় খাওয়াদাওয়ার অসুবিধার কথা আগেই বলেছি। এ সময়ে জওয়ানরা ঠিকমতো খাবার পেত না। লড়াইয়ের ষষ্ঠ দিনে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের একটি জওয়ান এসে জানালো তার গায়ে জ্বর, তার শরীর কাঁপছে এবং গত পাঁচদিন সে কোনো খাবার পায়নি। হাতের রাইফেল মাটিতে রেখে দিয়ে সে হতাশার সুরে বলে, খাওয়া ছাড়া কীভাবে লড়াই করি। আমার দ্বারা আর লড়াই করা সম্ভব না।

ক্যাপ্টেন মতিনকে লক্ষ করেই সে কথাগুলো বলে। জবাবে ক্যাপ্টেন মতিন শান্ত কণ্ঠে বলেন, দেখ, খাবার আমরাও পাইনি; কিন্তু তাই বলে লড়াই তো আর বন্ধ রাখা যায় না। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে খাবার না পেলেও লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

ক্যাপ্টেন মতিনের কথায় ছেলেটি অভিমানে রেগে উঠে বলে, স্যার, যদি খাবার না দেন, তাহলে লড়াই করতে পারব না। এই নিন আমার রাইফেল।

লড়াইয়ের ডিসিপ্লিনের স্বার্থে ক্যাপ্টেন মতিনকে কঠোর হতে হলো। সে ছেলেটিকে সঙ্গে সঙ্গে এরেস্ট করে। তাকে একটি কাঁঠালগাছের সঙ্গে রশি দিয়ে প্যাঁচিয়ে বাঁধেন।

তারপর বলেন, এরপর যদি কেউ খাবারের জন্য আসে, তাহলে তাকে তুমি একথা বলবে যে খাবারের জন্য যেও না, খাবার চাইতে গেলে আমার মতো অবস্থা হবে।

তখন ছেলেটির পাশ দিয়ে যে কেউ যাচ্ছিল, ছেলেটি তাদের ওই কথাগুলোই বলত।

প্রায় তিন ঘণ্টা ছেলেটিকে এভাবে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখার পর আমি ক্যাপ্টেন মতিনকে বলে তাঁকে ছাড়িয়ে দিই। তবে লড়াইয়ের বৃহত্তর স্বার্থে এবং নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষায় আমাদের কঠোর হতে হয়েছিল।

তেলিয়াপাড়ায় থাকাকালীন আমাদের হেডকোয়ার্টার ছিল সীমান্তে। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত। প্রায় একনাগাড়ে ছয়দিন লড়াই করার পর ক্যাপ্টেন মতিন এবং আমাকে সৈন্যসহ হেডকোয়ার্টারে উঠিয়ে নেওয়া হলো। আমাদের জায়গায় তেলিয়াপাড়ায় এলেন লে. মোরশেদ এবং তাঁর সৈন্যদল। তাঁরা ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য। লে. মোরশেদের সৈন্যদের সঙ্গে তেলিয়াপাড়ায় শত্রুবাহিনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। তেলিয়াপাড়ায় থাকাকালীন লে. মোরশেদ কয়েকটি চমৎকার অ্যাম্বুশ করেন। শুধু একটি অ্যাম্বুশেই পাতা মাইনের সাহায্যে দুই ট্রাকভর্তি শত্রুসৈন্য নিহত হয়, আহতও হয় প্রচুর। লে. মোরশেদ সেখানে কিছুদিন ছিলেন। পরে সেখানে মেজর সফিউল্লাহর নির্দেশে আমি পুনরায় তার স্থলাভিষিক্ত হই।

এ সময়কার একটি মজার ঘটনা বলি: লে. মোরশেদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পর সকাল ৮টায় ডিফেন্স পজিশন অর্থাৎ প্রতিরক্ষা অবস্থান পরিদর্শন করতে শুরু করি। উল্লেখ্য, চট্টগ্রামের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের কয়েকজন জওয়ান যাঁরা আমার অধীনে চাকরি করতেন, তাঁদের কয়েকজন সেসময়ে লে. মোরশেদের অধীনে যোগ দিয়েছিলেন। প্রতিরক্ষা অবস্থান চেক করতে গিয়ে এলএমজি পজিশনের কাছে ওদের কয়েকজন সিপাইয়ের সঙ্গে আমার ১০ মিনিট ধরে আলাপ হয়। জওয়ানদের মনোবল অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তখন তাদের নানাভাবে উৎসাহিত করে তুলছিলাম।

তারপর জওয়ানদের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে খোঁজ নিলাম। তখন আলাপ প্রসঙ্গে চট্টগ্রামে আমার অধীনে যারা চাকরি করেছিল, তাঁদের মধ্যে একজন আমাকে প্রশ্ন করল, স্যার, চট্টগ্রামে আমাদের কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া, তাঁর খবর কী? তিনি কি বেঁচে আছেন? আমরা শুনেছি তিনি নাকি চট্টগ্রামের লড়াইয়ে শহিদ হয়েছেন।

তাঁর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম, ছেলেটার মাথা খারাপ নাকি। সে আমার অধীনে চাকরি করেছে অথচ আজ আমাকেই চিনতে পারছে না।

যা হোক, উত্তর তাঁকে বললাম, তুমি আস্ত বোকা। কিন্তু উত্তর সন্তোষজনক না হওয়ায় সে আবারও প্রশ্ন করল, সত্যি স্যার, বলুন না, ক্যাপ্টেন ভূঁইয়ার খবর কী? তিনি কি বেঁচে নেই?

হেসে বলি, এতক্ষণ তুমি ক্যাপ্টেন ভূঁইয়ার সঙ্গেই কথা বলছ।

আমার জবাব শুনে সে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে যায়। গভীর দৃষ্টিতে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, স্যার, আপনি একেবারে বদলে গেছেন।

সত্যি বদলে যাওয়ার কথা। সেসময়ে আমার মাথায় চুল ছিল না। তাই সব সময়ই মাথায় ক্যাপ পরে থাকতাম। আমাকে চিনতে না পারার এর চেয়েও বড়ো কারণ, আমার তখন মুখভর্তি দাড়ি। পরনে একটা ছেঁড়া শার্ট ও লুঙ্গি। পা একেবারেই খালি। অতএব এ অবস্থায় আমাকে চিনতে আরও কঠিন ছিল বৈকি।

আমাদের যেসব সংগ্রামী তরুণ তেলিয়াপাড়ার লড়াইয়ে অংশ নিয়েছে, তাঁরা কখনো তেলিয়াপাড়ার কথা ভুলতে পারবে না। কারণ তেলিয়াপাড়ায়ই আমাদের সবচেয়ে বেশি কষ্টের ভেতর দিয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে। এই লড়াইয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর ক্ষতিও হয় প্রচুর। একদিনের লড়াইয়ে আমরা একটা সাত-টনি ট্রাক দখল করি। শত্রুবাহিনী তেলিয়াপাড়ায় আমাদের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করে। ১৭ দিন প্রাণপণ যুদ্ধের পর শত্রুবাহিনী আমাদের তিনদিক দিয়ে আক্রমণ করে। শত্রুর এই ত্রিমুখী আক্রমণের কারণে আমাদেরকে বাধ্য হয়ে তেলিয়াপাড়া ত্যাগ করতে হয়।

> তবুও এই ১৭ দিন মাটি কামড়ে পড়ে থাকায় বিরল কিছু অভিজ্ঞতা হয়। শত্রুর মেশিনগানের বিরুদ্ধে থ্রি নট থ্রি দিয়েও লড়াই চালিয়ে যাওয়া যায় যদি মনোবল থাকে। অনাহার, অন্ধকার, বৃষ্টি, শীতও হার মানে মানুষের দেশপ্রেমের কাছে

তবুও এই ১৭ দিন মাটি কামড়ে পড়ে থাকায় বিরল কিছু অভিজ্ঞতা হয়। শত্রুর মেশিনগানের বিরুদ্ধে থ্রি নট থ্রি দিয়েও লড়াই চালিয়ে যাওয়া যায় যদি মনোবল থাকে। অনাহার, অন্ধকার, বৃষ্টি, শীতও হার মানে মানুষের দেশপ্রেমের কাছে। আমরা সৈনিক বলেই যে কোনো প্রতিকূল অবস্থার জন্যই প্রস্তুত ছিলাম; কিন্তু যারা সাধারণ মানুষ, কৃষক, ছাত্র–এদের অসীম দেশপ্রেমের কোনো তুলনা ছিল না। বিশেষ করে ওয়াকার আর সাদেক। দুজনই তখন ইউনিভার্সিটির ছাত্র। পরে অবশ্য দুজনই সেনাবাহিনীতে কমিশন পায়। এই ওয়াকার আর সাদেক শত্রুর মনে ভীতিসঞ্চার করার জন্য গোটা দশেক থ্রি নট থ্রি রাইফেল এক জায়গায় জড়ো করে ওয়ান টু থ্রি বলে একসঙ্গে ফায়ার করত। বাজ পড়া শব্দের মতো সেই বিকট আওয়াজ নির্ঘাত শত্রুর বুকও কাঁপিয়ে দিত। তাই তেলিয়াপাড়া যুদ্ধের সেই দিনগুলোর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ওখানে যুদ্ধরত অবস্থায় আমরা নিত্যনতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি, যা অংশগ্রহণকারী ছাত্র-জনতাকে দক্ষ সৈনিকে রূপান্তর করতে সাহায্য করে।

লেখক: সংসদ সদস্য এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি

স্বাধীনতা ও বিজয়ের ৫২ বছর রাষ্ট্র ও জাতিগঠনের গতিপ্রকৃতি

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বিজয় লাভ করে। সেই বিজয়ের ৫২ বছর এবার আমরা উদ্‌যাপন করছি। পাকিস্তান পরাজয়ের ৫২ বছরের গ্লানি এবার কীভাবে উপলব্ধি করছে জানি না। তবে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলার জনগণের ওপর অপারেশন সার্চলাইট নামে সেনাবাহিনীর সদস্যদের ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশদানের মাধ্যমে যে গণহত্যা শুরু করেছিল, সেটি পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভয়ংকর চরিত্রেরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহন করে। সামরিক শাসকগোষ্ঠী নিরস্ত্র মানুষের ওপর এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে ধরে নিয়েছিল যে ব্যাপক হারে গণহত্যা, সন্ত্রাস, ভয়ভীতি, নেতাদের আটক কিংবা হত্যা করার মাধ্যমে স্বল্পসময়ের মধ্যেই তাদের পোড়ামাটি নীতি সফল করে ব্যারাকে ফিরে যেতে পারবে। সাধারণ মানুষ যেহেতু নিরস্ত্র, নেতারাও যেহেতু কোনো গেরিলাযুদ্ধের প্রস্তুতি নেননি, তাই তাদের ধারণা ছিল–ট্যাংক, কামান, বন্দুক এবং সশস্ত্র সেনাবাহিনীর অভিযানের মুখে কেউ দাঁড়াতে বা টিকে থাকতে পারবে না। সুতরাং জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফলে পূর্ববাংলার প্রধান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে তিন মাস কাটিয়ে দেওয়া যেহেতু সম্ভব হয়েছে, সেটিকে সম্পূর্ণরূপে ভন্ডুল করে দেওয়ার জন্য সামরিক বাহিনীর অভিযানই একমাত্র সমাধানের পথ হিসাবে পাকিস্তানের সামরিক শাসক এবং তাদের অনুসারী রাজনীতিবিদদের কাছে বিবেচিত ছিল। তারা এর বেশি কিছু দেখতে পারেনি। এ কারণেই ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে গণহত্যার অভিযানে নামে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। কিন্তু পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষ এবং স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক নেতৃত্ব এই আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে নামবে, স্বাধীনতার মতো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে, সেটি তাদের বিবেচনায় ছিল না। এ কারণেই তারা ২৫ মার্চের অপারেশন সার্চলাইটের আলো অল্প কদিনের মধ্যেই নিভে যাওয়ার পরিকল্পনা ও হিসাব কষেছিল। কিন্তু এটি স্বাধীনতার জন্য একটি জাতির মরণপণ যুদ্ধে রূপান্তরিত হবে, সেই রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও পরিণতিবোধ তাদের ছিল না। এ কারণেই ৯ মাস পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে গেরিলাযুদ্ধের

মোকাবিলা করতে হয়েছিল এবং ডিসেম্বরে মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর মিলিত যৌথ বাহিনীর সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে পাকিস্তানের রণক্লান্ত বাহিনী অনায়াসেই পর্যুদস্ত হয়ে গেল। স্বয়ং ইয়াহিয়া খান যুদ্ধের পরিণতি বুঝতে পেরে ১৪ ডিসেম্বরই যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দেন। এরপর আত্মসমর্পণের প্রস্তুতিতে দুদিন কেটে গেল। ১৬ ডিসেম্বর বিকাল ৪টা ৩১ মিনিটে পাকিস্তানের ৯৩ হাজার সেনা সদস্য ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করে। এটি ছিল পাকিস্তানের সেনা শাসক, সেনাবাহিনী, রাজনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে কলঙ্ক এবং গ্লানিকর দিন। অপরিণামদর্শী পাকিস্তানের শাসক ও রাজনীতিবিদদের জন্য এটিই সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার ছিল। তবে পূর্ববাংলায় ৯ মাস তারা যে রক্তপাত, হত্যাযজ্ঞ, বাঙালি নিধন, ধ্বংসযজ্ঞসাধন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণের মতো পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল, সেটি পাকিস্তান রাষ্ট্রের মানবতাবিরোধী চরিত্রের কলঙ্ক বহন করছে।

অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পূর্ববাংলার জনসাধারণ ২৩ বছর পাকিস্তান রাষ্ট্রকে চেনা, জানা ও বোঝার অভিজ্ঞতা থেকেই ধীরে ধীরে আত্মপরিচয়ের সন্ধানে নিজস্ব রাষ্ট্র লাভের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ২৫ মার্চের আগে মানসিক সেই প্রস্তুতি সব অস্ত্রের শক্তিকে তছনছ করে দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। এ কারণেই অপারেশন সার্চলাইটের মুখে দাঁড়িয়ে সেটিকে নিভিয়ে দেওয়ার প্রত্যুত্তর জানিয়ে দেয়। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার ডাক ৭ মার্চেই উচ্চারিত হয়েছিল, করণীয়ও নির্দেশিত ছিল। ২৬ মার্চ জানাজানি হয়ে গেল স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র হাতে লড়াই করতে হবে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেই লড়াইয়ের প্রস্তুতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই গ্রহণ করে। পাকিস্তানের সামরিক শক্তি যা ভাবতে পারেনি, তার চেয়েও অনেক বেশি চিন্তাভাবনা নিয়ে দেশের সাধারণ মানুষ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব একটি সশস্ত্র গেরিলাযুদ্ধ সংগঠিত করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। স্বতঃস্ফূর্ত সেই আবেগ ও স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা গোটা জাতিকে মুহূর্তের মধ্যে রণাঙ্গনে ঐক্যবদ্ধ করে ফেলে। সেই রণাঙ্গন তখন দখলীকৃত ভূখণ্ডেই শুধু নয়, দেশে-বিদেশে সর্বত্র গড়ে উঠতে থাকে। একটি জাতির স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন কীভাবে দেশে দেশে সমর্থিত এবং শক্তি অর্জন করতে থাকে, সেটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে রচিত হতে থাকে। মার্কিন সরকার পাকিস্তানিদের পক্ষে থাকলেও জনগণ ও গণতান্ত্রিক শক্তি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ধীরে ধীরে অবস্থান গ্রহণ করতে থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেরও জনগণের শক্তি-সমর্থন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে অংশ নেওয়া মানুষের পক্ষে ক্রমাগত যুক্ত হতে থাকে। প্রতিবেশী ভারত তার সীমান্ত খুলে দিয়ে পূর্ববাংলার মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ইতিহাসের এই দরজা খুলে যাওয়ার সম্ভাবনার দিকটি আগে ভাবতে পারেনি। তারা ভেবেছিল বাঙালি যাবে কোথায়? তাদের বুট জুতার নিচেই আমাদের সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণ মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকবে। কিন্তু স্বাধীনতার ইতিহাস কত বৈচিত্র্যপূর্ণ হতে পারে, সেই পাঠ তাদের সামরিক বাহিনী ও শাসকশ্রেণির ছিল না। পূর্ববাংলার মানুষ দেশের অভ্যন্তরে গেরিলাযুদ্ধ সংঘটিত করতে থাকে। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব মানুষের হাতে অস্ত্র, মনে সাহস ও শক্তি জুগিয়েছিল। পৃথিবীর গণতান্ত্রিক শক্তি আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। এ কারণেই পাকিস্তানের সেনাবাহিনী দেশের অভ্যন্তরে তাদের আক্রমণ, অত্যাচার, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ যত বাড়িয়ে দিয়েছিল, স্বাধীনতাকামী জনগণ তত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সরকার অত্যন্ত সচেতন ও পরিকল্পিত উপায়ে গেরিলাযুদ্ধকে জনযুদ্ধে, জনযুদ্ধকে বিজয়ের লক্ষ্যে পৌঁছানোর আয়োজন সংগঠিত করতে থাকে। ভারত এবং গণতান্ত্রিক বিশ্ব পাকিস্তান ও তাদের বন্ধুরাষ্ট্রের সব ষড়যন্ত্র একে একে অকার্যকর করে দিতে থাকে। জাতিসংঘে বাধা দেওয়া থেকে শুরু করে সপ্তম নৌবহর প্রেরণও অকার্যকর হয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের কূটনীতিতে আমাদের সরকার, ভারত, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন সব অপশক্তির আগ্রাসনকে স্তব্ধ করে দিতে সক্ষম হয়। পাকিস্তান যখন ৯ মাসের যুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতায় ক্লান্ত ও ক্ষিপ্ত হয়ে ভারত আক্রমণ করে, তখন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বুঝতে পারেনি মুক্তিযুদ্ধের সেনাবাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিত্রবাহিনীতে পরিণত হয়ে পাকিস্তানের দম্ভকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে যাচ্ছে। সেটি ঘটল ৩ ডিসেম্বর-পরবর্তী প্রতিটি দিন। ৬ ডিসেম্বর ভারত ও ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে ৯ মাসের রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রথম বহির্দেশীয় স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়। স্বাধীনতালাভের দরজা ক্রমেই প্রশস্ত হতে থাকে। রণক্ষেত্রে তখন পাকিস্তানের সেনাবাহিনী শুধু পর্যুদস্তই নয়, একে একে পলায়নও করতে শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধা এবং যৌথবাহিনী স্বাধীন ভূখণ্ডে স্বাধীনতার বিজয়ের পতাকা ওড়াতে শুরু করে। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেনাসদর থেকে বের হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো যৌথ বাহিনীর হাতে। পাকিস্তানের দম্ভ অপারেশন সার্চলাইট চিরতরে নিভে গেল। ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধ, সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতির পরও বিজয়ের উল্লাস, উচ্ছ্বাস, আনন্দ এবং স্বপ্ন নিয়ে ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় অর্জিত হলো।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতার বিজয় দিবসের ৫২ বছর আমাদের আজ অতিক্রান্ত হতে যাচ্ছে। স্বাধীন রাষ্ট্র এই ৫২ বছরে নানা অভিজ্ঞতায় এক পরিণত রাষ্ট্রে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। আমাদের ৫২ বছরের পথচলা খুব মসৃণ হয়নি। যাত্রাটি আমাদের শুরু হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর হাতেই। একটি অসাম্প্রদায়িক ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত জাতিরাষ্ট্র গঠনের শাসনতন্ত্র, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতি, রাষ্ট্রকাঠামো, 'কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়, সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব'–এই পররাষ্ট্রনীতিতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর তিনি স্থাপন করে দিয়েছিলেন। এই রাষ্ট্রটি নির্মিত হলে আমাদের জাতিরাষ্ট্র হবে আধুনিক, আমরা হব অসাম্প্রদায়িক। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে এমন একটি রাষ্ট্র গঠনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। ১৯৭৫ সালে সপরিবারে তাঁকে হত্যা করার পর ক্ষমতা দখলকারী গোষ্ঠী বাংলাদেশকে পাকিস্তানি ভাবাদর্শে ফিরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে থাকে। এর ফলে অসাম্প্রদায়িক জাতিরাষ্ট্র তৈরির প্রক্রিয়া ভয়ানকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। জাতিকে বিভক্ত করা হয় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিভেদ নীতিতে। রাষ্ট্র, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি পরস্পরবিরোধী দুই মেরুতে বিভক্ত হয়ে যায়। এটি একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ আগামী দিনের বাংলাদেশের জন্য। তবে স্বাধীনতার ৫২ বছরের ইতিহাসে মাত্র সাড়ে ২৩ বছর বাংলাদেশ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মুক্তিযুদ্ধের ভাবাদর্শে পরিচালিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে পাকিস্তানকে অনেক পেছনে ফেলে পৃথিবীর অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল রাষ্ট্রে পরিণত হতে যাচ্ছে। প্রায় সব সূচকে বাংলাদেশ পাকিস্তানকে পিছিয়ে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় এখন যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, তাতে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান অনেকটাই আমাদের নাগালের মধ্যে অবস্থান করছে। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করেছে। আগামী ২০৪১ সালে আমরা উন্নত-সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে আর্থসামাজিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলছি। যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বাধীনতার ৫২ বছর আমরা মুক্তিযুদ্ধের ধারায় অসাম্প্রদায়িক জাতিরাষ্ট্র গঠনের সুযোগ পেতাম, তাহলে আমাদের অর্জন এতদিনে উন্নত জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমৃদ্ধিতে ভরে উঠত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বর্তমানে মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৮২৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। উন্নত দেশে উন্নীত হলে তা হবে ১২ হাজার ডলারে। এতদিনে আমরা সেটিই অর্জন করতে সক্ষম হতাম। পঁচাত্তরের অপশক্তি ২৯ বছর আমাদের সেই উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত করেছে। এখন পেছনে ফিরে তাকিয়ে ইতিহাসের এই পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক মেরুকরণকৃত শক্তির অবস্থান ও চরিত্রকে মূল্যায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সামনের দিনগুলোয় এগিয়ে নেওয়ার প্রকৃত শক্তি বাছাই করে নিতে হবে। তাহলেই স্বাধীনতার বিজয় আমাদের রাষ্ট্র ও জাতিগঠনের মজবুত এক ভিত্তি তৈরি করতে সহায়তা করবে।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও কলামিস্ট

ইতিহাসের সিঁড়ি বেয়ে বাংলাদেশ

তানভীর ইমাম

বিজয়ের ৫১তম বর্ষ উদ্‌যাপনে যাচ্ছে দেশ। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বিজয়লাভ করে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ কেবল বাঙালির ইতিহাসেই নয়, পৃথিবীর সামসময়িক ইতিহাসেও বড়ো একটি ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি নিয়ে অনেকেই লিখেছেন, লিখছেন এবং বলেছেন-বলছেন। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে স্মৃতিচারণামূলক বইয়ের সংখ্যাও কম নয়। ১৯৭১ সালে আমি তখন ছোটো। মা-বাবার হাত ধরে ভারতে শরণার্থী হয়েছি। তাই মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সেভাবে ধারণ করতে পারিনি। আমার বাবা মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সূত্রে কলকাতায় মুক্তিযুদ্ধকালীন শরণার্থীশিবিরে আশ্রিত মানুষের দুর্বিষহ জীবন আমার কাছে এখনো আবছা হয়ে ধরা দেয়। তবে তা কোনোভাবেই লেখার উপজীব্য হিসাবে উঠে আসছে না। তখন রেডিয়োতে জয় বাংলা স্লোগান ও বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারিত হতে শুনতাম। আমি নিজেও বাসায় এই স্লোগান কণ্ঠে ধারণ করতাম। আমার সঙ্গে যোগ দিত আমার ছোটো বোনও। বারবার শেখ মুজিব শেখ মুজিব বলে স্লোগান তুলতাম।

হাজার বছরের ইতিহাস বাঙালির। এই দীর্ঘ সময়ে অসংখ্য বীর সন্তানের জন্ম হয়েছে এই ভূখণ্ডে। কিন্তু 'বাংলাদেশ' নামক একটি 'জাতিসত্তা রাষ্ট্র'-এর প্রতিষ্ঠাতা কেবল একজনই। তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ মুজিব গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার এক নিভৃত পল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই বাঙালির অধিকার আদায়ে সচেতন ছিলেন। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাহচর্যে এসে রাজনীতিতে নিজের একটা স্বতন্ত্র অবস্থান গড়েন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আন্দোলনের পথ বেয়েই তিনি বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর আমরা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস থেকে বঞ্চিত ছিলাম দীর্ঘদিন। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস একটা প্রজন্মের কাছে পৌঁছায়নি বলেই আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা, মহান বিজয় দিবস এখনো কিছু লোককে নাড়া দেয় না

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১। এই ভূখণ্ডের দীর্ঘ ২৩ বছরের শোষণ ও বৈষম্যের ইতিহাস। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা এবং উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সিঁড়ি বেয়েই আসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান প্রায় ১২০০ মাইলের। ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতির ক্ষেত্রে দুটি ভূখণ্ডের ব্যবধান ছিল যোজন যোজন। কেবল ধর্মভিত্তিক বন্ধনই ছিল দুই খণ্ডের ঐক্য টিকিয়ে রাখার একমাত্র অবলম্বন। ভারত ভাগের শুরুতেই পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ ও বৈষম্য এই অঞ্চলের মানুষের বোধে আঘাত হানে। প্রথম আঘাতটাই আসে ভাষার ওপর। পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ৬০ ভাগ বাঙালি হওয়ার পরও উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। এটাই পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাঙালির অধিকার আদায়ে প্রথম লড়াই। ভাষার জন্য রক্ত দেয় বাঙালি। রক্তের পথ বেয়েই এ দেশের মানুষ অধিকার ছিনিয়ে আনে। এরই ধারাবাহিকতায় দীর্ঘ ২৩ বছরের শোষণ ও বৈষম্যের পর বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠায় 'স্বাধীনতা'র কোনো বিকল্প ছিল না। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ছিল এই দীর্ঘ আন্দোলন আর সংগ্রামেরই চূড়ান্ত পর্যায়, যা সংঘটিত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসনে ১৪ বছরই কারাগারে ছিলেন বঙ্গবন্ধু। সেই ছাত্রাবস্থা থেকে আন্দোলন-সংগ্রামের পথ বেয়ে তিনি হয়েছেন বঙ্গবন্ধু। আর বঙ্গবন্ধু থেকে বাঙালি জাতির পিতা। আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা নিয়েই বঙ্গবন্ধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। তিনি দেশপ্রেম, মেধা আর আত্মত্যাগে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শোষণের বিরুদ্ধে জাতিকে জাগিয়ে তোলেন, সচেতন করে তোলেন। আন্দোলনে একচ্ছত্রভাবে বেগবান ও অপ্রতিরোধ্য করে তোলেন। একজন রাজনীতিবিদের জীবনে এটা বিস্ময়কর সাফল্য। নেতৃত্বের গুণেই তিনি বাঙালির মানস, মাটি আর আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। এ দেশের মানুষ তাঁর আহ্বানেই পরিবার-পরিজন ছেড়ে দেশমাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করতে দীর্ঘ ৯ মাস জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন। মূলত ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'–এই ঘোষণার মধ্য দিয়েই এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে যায়। খুঁজে পায় গেরিলাযুদ্ধের কৌশল ও দিকনির্দেশনা। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে গ্রেফতারের আগে বঙ্গবন্ধুর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর জাতিকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। আপামর জনতা 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান বুকে ধারণ করে মরণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিপাগল বাঙালির রক্তের বন্যায় ভেসে যায় পাকিস্তানের দক্ষ, প্রশিক্ষিত ও আধুনিক সেনা পরাশক্তি। দীর্ঘ ২৩ বছরের শোষণ ও বঞ্চনার পথ বেয়ে, নয় মাসের সশস্ত্র লড়াই, ৩০ লাখ শহিদের আত্মত্যাগ আর তিন লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানির মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় আমাদের বিজয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ছিল বিজয়ের দিন। সেদিন বিকালে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বাংলাদেশে অবস্থিত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক লে. জে. এ এ কে নিয়াজী হাজার হাজার মুক্তিকামী উৎফুল্ল জনতার সামনে প্রায় ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণের দলিলে সই করেন। সেদিন একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে বাংলাদেশ বিশ্বের মাত্রচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি আমরা। শেখ মুজিবই মহান এক রাজনীতি-পুরুষ, যিনি তাঁর অনন্যসাধারণ নেতৃত্বে জাতির অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করেছিলেন। শেখ মুজিব ছিলেন রাজনীতির এমনই এক মহানায়ক, যাঁর রাজনীতি কখনো গোপন পথে বিচরণ করেনি। জীবনের বেশির ভাগ সময় পাকিস্তানি শাসকদের হাতে কারা নির্যাতন ভোগ করেছেন। অসংখ্যবার গ্রেফতারও হয়েছেন। বহু মামলায় জড়ানো হয়েছে তাঁকে। কিন্তু চরম নির্যাতনেও তিনি ভেঙে পড়েননি, পরাজিত হননি। বলা হয়, নেতাজি সুভাষ বসুর পর তিনিই হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির মুক্তির প্রতীক। নিপীড়িত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সাহসের প্রতীক। তাঁর সাহস, ত্যাগ ও আদর্শনিষ্ঠতা গণমানুষের কাছে নন্দিত হয় ব্যাপকভাবে। ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা, ত্যাগ ও আদর্শনিষ্ঠা তাঁকে বসিয়েছিল বাঙালির জাতীয় ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য এক আসনে। আমার জানামতে, এমন অসাধারণ জনপ্রিয়তা এ ভূখণ্ডে আর কোনো রাজনৈতিক নেতার ভাগ্যে জোটেনি।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর আমরা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস থেকে বঞ্চিত ছিলাম দীর্ঘদিন। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস একটা প্রজন্মের কাছে পৌঁছায়নি বলেই আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা, মহান বিজয় দিবস এখনো কিছু লোককে নাড়া দেয় না। তাই বারবার প্রকৃত ইতিহাসের কথা বলতে হয়। শুধু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসই নয়, অনেকেই জানেন না আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি ও তার ইতিহাস। বলা চলে, সঠিক তত্ত্বাবধানের অভাবেই তারা বড়ো হচ্ছেন

ভিন্ন সংস্কৃতিতে। এই দেশে জন্মগ্রহণ করে, এই দেশের আলো-বাতাস গায়ে মেখে ওরা বড়ো হচ্ছে ভিন্নধারায়–এটা দুঃখজনক। মাঝে মাঝে ভাবি, ৫১ বছর আগে বিজয় অর্জন করেও কি সত্যিকার অর্থে আমরা বিজয়ী হতে পেরেছি? আমরা কি পেরেছি স্বাধীনতার সুফল সবার কাছে পৌঁছে দিতে? এর জবাব সবার জানা। তারপরও আশার জায়গা রয়েছে, মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দলের নেতৃত্বে চলছে বর্তমান সরকার। ভরসা আছে সরকারপ্রধান জাতির পিতার কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি। তিনি জাতির পিতার যোগ্য উত্তরসূরি। তিনি শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিএনপি-জামায়াতের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের পরও একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্তদের বিচারকাজ এগিয়ে নিয়েছেন, নিচ্ছেন। শীর্ষ অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। বিচারের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছেন।

আজ আমরা স্বাধীনতার ৫১ বছর পার করে এগিয়ে চলছি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র হিসাবে, যা দেখে বহু উন্নত দেশ আমাদের রোল মডেল মনে করে। বঙ্গবন্ধুকন্যা আমাদের একটা সম্মানের জায়গায় এনেছেন। এবারের বিজয় দিবস এমন একটা প্রেক্ষাপটে পালিত হচ্ছে, যখন ৬ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয়-সেবা দিয়ে বাংলাদেশ মানবতার সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা দেখাল। যার একক কৃতিত্ব জননেত্রী শেখ হাসিনার। একাত্তরে এক কোটি বাঙালি শরণার্থীর দুর্বিষহ জীবনচিত্র শেখ হাসিনাকে যেভাবে ব্যথিত করেছিল, একইভাবে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কষ্ট তাঁকে ব্যথিত করে। তাই তো তিনি মমতাময়ী মা। যিনি বিপদগ্রস্ত রোহিঙ্গাদের জন্য কাঁদেন। কুতুপালংয়ে গিয়ে অসহায় রোহিঙ্গা শিশু ও নারীদের জড়িয়ে ধরে কেঁদেছেন তিনি। তাদের এই বিপদে পাশে থাকার কথা বলেছেন তিনি। শেখ হাসিনার এই মানবিক আবেদন 'Mother of humanity' সম্মান এনে দিয়েছে। তাঁকে বলা হয় 'Star of the east'।

> আজ আমরা স্বাধীনতার ৫১ বছর পার করে এগিয়ে চলছি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র হিসাবে, যা দেখে বহু উন্নত দেশ আমাদের রোল মডেল মনে করে

২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি সরকার গঠন করে টানা তিন মেয়াদে ১৪ বছর ধরে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। আজ ৬ জানুয়ারি পূরণ হলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার ক্ষমতার টানা ১৪ বছর। আওয়ামী লীগ সরকারের একটানা ১৪ বছরে বদলে গেছে বাংলাদেশের চিত্র। ক্ষমতার এই ১৩ বছর ধরেই দেশের মানুষসহ গোটা বিশ্ব দেখছে বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি ও সফলতার ক্ষেত্রে রেকর্ডসংখ্যক টানা তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসা বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার ক্যারিশমেটিক লিডারশিপ। চালকের আসনে থেকে দেশের পুরো চেহারাই বদলে দিয়েছেন তিনি। সরকারের উন্নয়ন-অগ্রগতি ও সাফল্যের নিচে ঢাকা পড়ে গেছে অতীতের চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক নেতিবাচক রাজনীতির ইতিহাস। ক্ষমতার এই ১৪ বছরে দেশের মাটিতে কুঁড়েঘর, ছনের ছাউনি কিংবা বিদ্যুৎহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশের সেই চিত্র এখন কেবলই ইতিহাস, নিয়েছে জাদুঘরে ঠাঁই। দেশের শতভাগ মানুষের ঘরে এখন বিদ্যুতের রোশনাই, সর্বত্র পাকা রাস্তা, পুল-ব্রিজ-কালভার্ট, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, পদ্মার বুক চিড়ে পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল–এসবই বর্তমানে বাংলাদেশের বদলে যাওয়ার বাস্তব চিত্র। দেশের এই সত্যিকারের বদলে যাওয়ার প্রধান রূপকারই হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। 'তলাবিহীন ঝুড়ির' অপবাদকে চ্যালেঞ্জ করে বাংলাদেশ এখন সারা বিশ্বের সামনে উন্নয়নের রোল মডেল। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে সগৌরবে যাত্রা শুরু করল পদ্মা সেতু। এই সেতু বাংলাদেশের আত্মমর্যাদার ও সততার প্রতীক। সক্ষমতা, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সততা, অদম্য সাহস, স্বাধীনচেতা মনোভাব, দূরদর্শী পরিকল্পনা, সর্বোপরি দেশের প্রতি ভালোবাসা এই সেতু তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তাঁর হাত ধরে পার্বত্য শান্তিচুক্তি, ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি, সিটমহল সমাধান হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের বিরোধপূর্ণ সাড়ে ২৫ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকার মধ্যে প্রায় সাড়ে ১৯ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা বাংলাদেশকে দিয়ে ভারতের সঙ্গে নতুন সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক সালিশি আদালত। জাতির পিতার কন্যার হাত ধরে ছাত্ররাজনীতি ও জাতীয় রাজনীতিতে এসেছে গুণগত পরিবর্তন।

তাঁর উদ্যোগে বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালু হওয়ার পর 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১'-এর বিগত তিন বছরে মোট আয় ৩০০ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে। বর্তমানে কোম্পানির মাসিক আয় প্রায় ১০ কোটি টাকা, যার প্রায় পুরোটাই দেশীয় বাজার থেকে অর্জিত হচ্ছে। সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত হতদরিদ্র, অসহায়, বয়স্ক নারী-পুরুষ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা মাসিক ভাতা পাচ্ছেন। সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, বঙ্গবন্ধু টানেল, মেট্রোরেল, গভীর সমুদ্রবন্দর প্রভৃতি বড়ো প্রকল্পের বাস্তবায়নই বলে দিচ্ছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে চলছে।

শেখ হাসিনা জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত করেছেন, সংকট উত্তরণে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। তাই তিনি হয়ে উঠেছেন বিশ্বনেতা, শান্তির অগ্রদূত। তাঁর নেতৃত্বে বিশ্বসভায় বাংলাদেশ লাভ করেছে মর্যাদার আসন। আমরা সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ ও মৌলবাদমুক্ত দেশ গড়ার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে এবার বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করতে চাই।

লেখক: সংসদ সদস্য, সিরাজগঞ্জ-৪

বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা

অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান

আমরা বিজয়ের ৫১ বছর অতিক্রম করছি। ৫১ বছরে অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে। এখন প্রয়োজন অতীতের ভুলভ্রান্তি শুধরিয়ে ইতিহাসের সত্যকে স্বীকার করে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ওপর নির্ভর করে। স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে সমসাময়িক অন্যান্য রাজনৈতিক দলের জাতীয় নেতা ছিলেন মওলানা ভাসানী, মণি সিংহ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ। তাঁরা সবাই স্বাধীনতার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন এবং জনগণকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের ওপর আস্থা রাখতে বলেছেন। বঙ্গবন্ধুসহ তৎকালীন জাতীয় নেতাদের দেশপ্রেম, জনগণের জন্য গভীর ভালোবাসা, দীর্ঘ ত্যাগ প্রশ্নাতীত। বাঙালির অধিকার আদায় এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রয়োজনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে তাঁদের সব আন্দোলন এক মোহনায় মিশে গিয়েছিল।

১৯৪৭ সালের পাকিস্তানের স্বাধীনতার স্বপ্ন ভাঙতে পূর্ববাংলার বাঙালিদের বেশি সময় লাগেনি। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে যায়। নতুন স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়া তো দূরের কথা, আবার নতুন করে অধিকার আদায়ের জন্য রাজপথে আন্দোলন-সংগ্রামে নামতে হয় বাঙালি জাতিকে। তখন নেতৃত্ব দিয়েছেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ। সেসময় পূর্ববাংলার রাজনীতিতে তরুণ নেতাদের উত্থান হয়। সাহস, উদ্যোগ, পরিশ্রম, আন্তরিকতা এবং স্পষ্ট বক্তব্য দেওয়ার জন্য সবার দৃষ্টি কাড়েন তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। শৈশব-কৈশোর থেকেই যিনি দেশের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হয়ে উঠেন। সেসময় তিনটি বিষয় তাঁকে দারুণভাবে আলোড়িত-অনুপ্রাণিত করে: ১. বাংলার রূপ-প্রকৃতি আকৃষ্ট করে জাগিয়ে তুলে গভীর দেশপ্রেম। ২. বাংলার দুঃখী মানুষের কষ্ট-যন্ত্রণা-বঞ্চনা তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করে

তোলে। ৩. পরিবারের অসাধারণ সহযোগিতা–বাবা-মা-স্ত্রী-সন্তান কখনো পারিবারিক বন্ধন বা ভালোবাসার আবেগ দিয়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি বরং সব সময় বাড়িয়ে দিয়েছে সহযোগিতার হাত নিজেদের বঞ্চিত করে।

বাবা শেখ লুৎফর রহমানের একটি উপদেশ 'Sincerity of purpose and honesty of purpose' বঙ্গবন্ধুর চিরকালের প্রেরণা হয়ে ছিল। সেই থেকে বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেন এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করেন বাংলার মানুষের মুক্তি, বাংলার স্বাধীনতা এবং দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। এ লক্ষ্যেই তাঁর সব ধ্যানজ্ঞান-জীবনযাপন, কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কিছু চিত্র এখানে তুলে ধরতে চাই।

১৯৬২ সালের ২৪ মার্চ মাঝরাতে দৈনিক ইত্তেফাকে শেখ মুজিব, মানিক মিয়া এবং ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় উপহাইকমিশনের পলিটিক্যাল অফিসার শশাঙ্ক শেখর ব্যানার্জির একটি বৈঠক হয়। প্রায় দুই ঘণ্টা আলোচনার পর শেখ মুজিব ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছানের জন্য একটি চিঠি ব্যানার্জির হাতে দিলেন। চিঠিটি নানা নিয়ম মেনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কাছে পৌঁছানো হয়েছিল। চিঠিতে বলা হয়েছিল–পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৬৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চের মধ্যে শেখ মুজিব লন্ডনে স্বাধীনতার ঘোষণা করে প্রবাসী সরকার ঘঠন করবেন। ভারত তখন চীনের সঙ্গে যুদ্ধে বিপর্যস্ত। দিল্লি থেকে খবর পাঠানো হলো, মুজিবের প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর বিবেচনায় আছে, তবে তাঁকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। মুজিব ভাবলেন, ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসের আমলাদের কারণেই দেরি হচ্ছে। তিনি কৌশল পালটালেন। ১৯৬৩ সালের ২৭ জানুয়ারি শেখ মুজিব গোপনে আগরতলা গিয়ে ১৫ দিন অবস্থান করেন। ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সঙ্গে তাঁর কয়েক দফা বৈঠক হয়। শেখ মুজিবের প্রস্তাব অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাবটি পেশ করেন। প্রধানমন্ত্রী মুজিবকে জানিয়ে দেন, তাঁকে সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে সম্মতি আছে; কিন্তু সবকিছু ঢাকা ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমেই যোগাযোগ রাখতে হবে, আগরতলার মাধ্যমে নয়। ১৯৬৩ সালের পর তিনি আর আগরতলা যাননি বলে জানা যায়। ভারতের সাহায্য নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করার কৌশল সম্ভবত তিনি পরিবর্তন করেছিলেন।

১৯৫৫ সালের ২৬ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদে শেখ মুজিব স্পিকারের উদ্দেশে বলেছিলেন, "মহোদয়, আপনি দেখবেন যে, 'পূর্ব বাংলা' নামের বদলে তারা 'পূর্ব পাকিস্তান' বসাতে চায়। আমরা কতবার দাবি জানিয়েছি যে এটা হবে 'বাংলা'। বাংলার একটা ইতিহাস আছে, এর নিজস্ব ঐতিহ্য আছে। জনগণের সঙ্গে আলোচনা করেই কেবল এটা বদলানো যায়। যদি আপনারা এটা পরিবর্তন করতে চান, তাহলে আমরা বাংলায় ফিরে যাব এবং মানুষকে বলব তারা এটা গ্রহণ করবে কিনা।"

১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানে নতুন সংবিধান চালু হলো। পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের যাত্রা শুরু হলো। সংবিধানে উর্দুর সঙ্গে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। নতুন সংবিধান চালু হওয়ায় পর পূর্ববাংলা আনুষ্ঠানিকভাবে হয়ে গেল পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ববাংলা নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান রাখার ব্যাপারে শেখ মুজিবের ঘোরতর আপত্তি ছিল।

১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুদিবসে তাঁর সমাধি প্রাঙ্গণে এক আলোচনাসভায় শেখ মুজিব একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেন, "একসময় দেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকু মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে, আমি ঘোষণা করিতেছি–আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।" (দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ডিসেম্বর ১৯৬৯)

১৯৭০ সালের এপ্রিলে ইয়াহিয়াকে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে একটি গোয়েন্দা প্রতিবেদন দেখানো হয়। এর সঙ্গে ছিল টেপে ধারণকৃত বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ। তিনি বলছেন, 'আমার লক্ষ্য বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। নির্বাচন হয়ে গেলে আমি এলএফও ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলব। নির্বাচনের পরে কে আমাকে চ্যালেঞ্জ করবে?' ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরেছিলেন।

১৯৭০ সালের ৭ জুন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভার মাধ্যমে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনি প্রচারকাজ শুরু করেন। সভায় তিনি ঘোষণা করেন, 'আইয়ুবনগর এখন থেকে হবে শেরেবাংলা নগর, রেসকোর্স হবে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।' এই জনসভায় বঙ্গবন্ধু প্রথমবার 'জয় বাংলা' স্লোগান উচ্চারণ করেন।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতার নির্দেশনা দেশবাসীর সামনে স্পষ্ট করেছেন। সেদিন থেকেই বাংলার মানুষ স্বাধীনতার চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করেন। গোটা বাঙালি জাতি তখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ছিলেন আস্থাবান এবং একাট্টা।

১৯৭১ সালের রক্তস্নাত ২৫ মার্চের কালরাত্রি। বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বরের বাড়ি। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, গাজী গোলাম মোস্তফা ও অন্য নেতাদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু প্রায় সারাক্ষণ নিচের লাইব্রেরি রুমে বসেছিলেন। সেদিন সবার চোখে-মুখে ছিল উদ্‌বেগ ও উৎকণ্ঠার ছাপ। একমাত্র বঙ্গবন্ধুই মুখে সেনাপতির সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সবার সঙ্গে আলাপ করছেন। এরই মাঝে বঙ্গবন্ধু অন্যান্য ছাত্র ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ এবং নির্দেশ দিয়ে এক এক করে বিদায় দেন। রহস্যের ব্যাপার, সেদিন খন্দকার মোশতাক আহমেদকে কখনো দেখা যায়নি। বঙ্গবন্ধুর বন্ধুরা তাঁকে ঢাকা ছেড়ে যেতে সম্মত করার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তিনি রাজি হননি। তিনি সাংবাদিকদের পরে বলেছিলেন, 'আমার জনগণকে রক্ষা করবার দায়িত্ব ছিল। আমি যদি সেখানে না থাকতাম তবে আমার খোঁজে ইয়াহিয়া খান গোটা শহর জ্বালিয়ে দিত।'

বঙ্গবন্ধু বাড়িতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ, তাঁর জীবনে গ্রেফতার কোনো নতুন বিষয় ছিল না। তাঁকে হতোদ্যম করার জন্য বহুবারই কারাগারে আটক করা হয়েছে। কিন্তু সামরিক শাসকদের চক্রান্ত সব সময়ই ব্যর্থ প্রমাণ হয়েছে। এবার তারা তাঁকে মেরে ফেলতেও পারে, তবে সেটা তাঁর কাছে গৌণ ব্যাপার ছিল।

একটি দেশের নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা পালিয়ে যেতে পারেন না। সে রাতে এত উত্তেজনার মধ্যেও বঙ্গবন্ধু শান্তভাবে পাইপ টানছিলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁর যা কিছু করণীয়, সবই তিনি করেছেন। ইতোমধ্যে সারা পূর্ববঙ্গের টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত তিনি বাঙালি জনগণকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে ফেলেন। শুধু গ্রেফতার কেন, যে কোনো পরিস্থিতির জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন।

২৫ মার্চের কালরাত্রিতে একটি দেশের জন্মের প্রসববেদনার সময় আঁতুড়ঘরে ফেলে কি কখনো কোনো পিতা চলে যেতে পারে? উদ্ধৃত ঘটনা এবং কথার মধ্য থেকে বোঝা যায়, পিতার দায়িত্ববোধ, চূড়ান্ত Commitment, সর্বোচ্চ ত্যাগ এবং ঝুঁকি নেওয়ার অসম সাহস। একা একটা মানুষ পাকিস্তান নামক একটি রক্তপিপাসু সামরিক জান্তার দেশের মুখোমুখি। তাঁকে উড়িয়ে দিতে পারত, নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারত–এসব তিনি কিছুই ভাবেননি। তিনি প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন ২৪ বছরের তিলে তিলে গড়ে ওঠা স্বাধীনতার গর্ভপাত গোলা-বারুদ,

১৯৭১ সালে গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন স্যার এডওয়ার্ড হিথ। তিনি ১৯৯৬ সালের এপ্রিলে লিখিতভাবে এই মর্মে বিবৃতি দিয়েছেন যে, '১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে নতুন দেশের নাম ঘোষণা করেন।'

আগুন, কান্না আর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এটি কেবল সম্ভব ছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষেই। তিনিই সঠিক পিতা।

'কায়হান ইন্টারন্যাশনাল' পত্রিকার সাংবাদিক আমির তাহেরি একাত্তরের জুলাই নাগাদ জেনারেল টিক্কা খানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনি শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করেছিলেন কেন?' টিক্কা খান জবাব দিয়েছিলেন, 'আমার কো-অর্ডিনেশন অফিসার একটি তিন ব্যান্ড রেডিয়ো নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বলেছিল, স্যার শুনুন, শেখ সাহেব স্বাধীনতার ঘোষণা করছেন। আমি নিজে রেডিয়োর এক বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সিতে সেই স্বাধীনতার ঘোষণা শুনি। তাই তাঁকে গ্রেফতার করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না।' সাংবাদিক আরও জানতে চাইলেন, 'তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে শেখ মুজিবও যদি ভারতে যেতেন তবে সেক্ষেত্রে আপনি কী করতেন স্যার?' উত্তরে টিক্কা খান বলেছিলেন, 'আমি খুব ভালো করে জানি মুজিবের মতো একজন নেতা তাঁর জনগণকে পরিত্যাগ করবে না। আমি গোটা ঢাকা শহরে তাঁকে খুঁজে বেড়াতাম এবং একটি বাড়িও তল্লাশির বাইরে রাখতাম না। তাজউদ্দীন অথবা তাঁর মতো অন্য নেতাদের গ্রেফতারের কোনো অভিপ্রায় আমার ছিল না। এ কারণেই তাঁরা এত সহজে ঢাকা ছেড়ে যেতে পেরেছিলেন।' জেনারেল টিক্কার এই উক্তি থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়, বঙ্গবন্ধুই তাদের চিন্তার প্রধান কারণ ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতারের ঘটনা সম্পর্কে মেজর সিদ্দিক সালেক তাঁর 'উইটনেস টু সারেন্ডার' গ্রন্থে লিখেছেন, 'যখন প্রথম গুলিবর্ষণ করা হয়, তখন রেডিয়ো পাকিস্তানে ক্ষীণভাবে শেখ মুজিবের কণ্ঠ শোনা যায়। মনে হলো, পূর্বে রেকর্ডকৃত বাণী। শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ঘোষণা করেছেন। কয়েক মিনিট পর ৫৭ ব্রিগেডের মেজর জাফর তাঁর বেতার কণ্ঠ শুনতে পেলেন (বিগ বার্ড ইন দ্য কেজ)।'

২৫ মার্চ রাতে যখন প্রায় ১২টা বাজে, এমন সময় একটা টেলিফোন এলো, বঙ্গবন্ধুর পার্সনাল এইড হাজি গোলাম মোরশেদ টেলিফোন ধরলে ওপাশ থেকে বলেন, বঙ্গবন্ধুকে বলেন মেসেজ পাঠানো হয়ে গিয়েছে। মেশিন নিয়ে কী করব? তখন বঙ্গবন্ধু হাজি গোলাম মোরশেদকে বললেন, ওই ব্যক্তিকে বলো মেশিন ভেঙে সে যেন পালিয়ে যায়। লন্ডনের দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিক ও দক্ষিণ এশিয়ার করেসপনডেন্ট ডেভিড লোশাক, যিনি সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ভাষণটি উল্লেখ করেন। তিনি লিখেছিলেন, গলার আওয়াজ খুব ক্ষীণ ছিল এবং যাতে মনে হচ্ছিল খুব সম্ভবত ওটা আগেই রেকর্ড করা ছিল।

পাকিস্তানি বাহিনী ট্রান্সমিটার খুঁজতে ইস্টার্ন ওয়্যারলেস ডিভিশনের ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার প্রকৌশলী নূরুল হকের ওয়্যারলেস কলোনির বাসা ঘেরাও করে এবং ২৯ মার্চ ওনাকে বাসা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তিনি আর ফিরে আসেননি। প্রকৌশলী নূরুল হক খুলনা থেকে একটি ট্রান্সমিটার বঙ্গবন্ধুর বিশেষ ব্যবহারের জন্য এনেছিলেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে সামরিক বাহিনীর আক্রমণের অব্যবহিত আগে এবং পাকিস্তান বাহিনী কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারের প্রাক্কালে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা ছিল নিম্নরূপ: 'এটিই সম্ভবত আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণের কাছে আমার আহ্বান, আপনারা যে যেখানেই থাকুন এবং আপনাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করুন। যতদিন পাক হানাদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটি বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত না হয় এবং যতদিন আমাদের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হয়, ততদিন সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।'

শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তাটি পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে সারা দেশে প্রচারের জন্য মধ্যরাতের কিছুক্ষণ পরে চট্টগ্রামে পাঠানো হয়। ২৬ ও ২৭ মার্চে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র (পরের নামকরণ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র) থেকে বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতার আরও দুটি ঘোষণা প্রচার করা হয়।

২৫ মার্চ রাতে সুবেদার মেজর শওকত আলী পিলখানায় নিজের কর্মক্ষেত্রে ছিলেন। তাঁর পরিবারের আর সবাই ছিলেন রাজশাহীতে। তিনি সিগন্যাল কোরে বাঙালিদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। আজিমপুর ফটকে প্রহরারত সৈনিকমারফত রাত ১০টার কিছু পরে তাঁর কাছে খবর পৌঁছে যায়। তাঁর সঙ্গে ওই রাতে আরও দু-একজন ছিলেন। রাত সোয়া ১২টার দিকে ওয়্যারলেসে স্বাধীনতার ঘোষণা সংবলিত খবর পাঠানো অবস্থায় তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। শহিদ সুবেদার মেজর শওকত আলীর কন্যা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সেলিনা পারভীনের সাক্ষাৎকারে এই তথ্যগুলো পাওয়া যায়।

সেই রাতে স্বাধীনতার ঘোষণা সুবেদার মেজর শওকত আলী যখন পাঠাচ্ছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন সিগন্যালম্যান আব্দুল মোত্তালিব। আব্দুল মোত্তালিব সেই বিরল মানুষদের একজন, যিনি ওই রাতে শহিদ শওকত আলীর সঙ্গে গ্রেফতার হয়েও বেঁচে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। তাঁর একটি সাক্ষাৎকার অধ্যাপক সেলিনা পারভীন নিয়েছেন। সেখান থেকেই এই সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠাতে সুবেদার মেজর শওকত আলী 'মোটোরোলা এসবিসি-৩' সেট ব্যবহার করেছিলেন। এটি ইপিআর সিগন্যাল কোরে ব্ল্যাকসেট বলে জনপ্রিয় ছিল। সেটটিতে ভয়েস অপশন ও টিজি অপশন দুটোই ছিল।

বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যায়, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের ঢাকার পরিস্থিতি ও শেখ মুজিবকে আটক এবং স্বাধীনতার ঘোষণা করার ঘটনা ২৭ মার্চেই বিশ্বের অন্তত ২৫টি দেশের পত্রিকা বা সংবাদ সংস্থার খবরে প্রকাশিত হয়।

২৬ মার্চ থেকে হোয়াইট হাউজে প্রতিনিয়ত একদিন দুইদিন পরপর রিপোর্ট এবং পূর্ব পাকিস্তানের বিষয় নিয়ে মিটিং হতে থাকে। ২৯ মার্চ প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের সঙ্গে কিসিঞ্জারের আলাপে নিক্সনের ইয়াহিয়ার প্রতি সমর্থনের কথা প্রকাশ্যে উঠে আসে। ২৬ মার্চের ইমারজেন্সি ওয়াশিংটন বিশেষ কর্মসূচি গ্রুপ মিটিংয়ে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করা বঙ্গবন্ধুর সব প্রস্তুতি ছিল মোক্ষম সময়ে স্বাধীনতার ঘোষণা করে প্রয়োজনে তিনি কারাবরণ করবেন। করেছেনও, তাই ২৫ মার্চ ঢাকা শহরে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেলে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা সংবলিত বাণী পাঠান, যা তিনটি মাধ্যম থেকে প্রচারিত হয়েছিল।

১৯৭১ সালে গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন স্যার এডওয়ার্ড হিথ। তিনি ১৯৯৬ সালের এপ্রিলে লিখিতভাবে এই মর্মে বিবৃতি দিয়েছেন যে, '১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে নতুন দেশের নাম ঘোষণা করেন।' সেই লিখিত দলিলে তিনি উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ছিল একটি ন্যায়সংগত যুদ্ধ এবং গণতান্ত্রিক যুদ্ধ। বাঙালি জাতির ওই স্বাধীনতাযুদ্ধ ছিল সে সময়ের বিশ্বে সংঘটিত অন্যতম মহান ঘটনা।

১৯৭১ সালে গণপরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা ১০ এপ্রিল কলকাতায় মিলিত হয়ে তাঁরা একটি প্রবাসী আইন পরিষদ গঠন করে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের খসড়া প্রণয়ন করেন। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী বৈদ্যনাথতলায় (পরবর্তী নাম মুজিবনগর) এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে গণপরিষদ সদস্য অধ্যাপক এম ইউসুফ আলী আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। এ ঘোষণার মাধ্যমে নবগঠিত আইন পরিষদ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করে। এ ঘোষণায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন এবং ২৬ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা কার্যকর বলে ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণাবলে প্রবাসী মুজিবনগর সরকার বৈধ বলে বিবেচিত হয় এবং এ ঘোষণায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সবার মধ্যে চেইন অব কমান্ড স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিলে।

স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালের ২২ মার্চ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ, ১৯৭২ (Constitutent Assembly of Bangladesh Order, 1972) জারির মাধ্যমে ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ গণপরিষদ। তবে বহিষ্কৃত ও পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য পোষণকারী সদস্যরা গণপরিষদের সদস্যপদ লাভের অযোগ্য ছিলেন। বাংলাদেশ গণপরিষদের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল।

মাননীয় স্পিকার সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে 'স্বাধীনতা ঘোষণা' সম্পর্কিত প্রস্তাবটি পরিষদের সামনে উপস্থাপন করেন, যা ছিল নিম্নরূপ:

"বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক স্বাধীনতাসংগ্রামে বাংলাদেশের যে বিপ্লবী জনতা, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী, বীরাঙ্গনা, প্রতিরক্ষা বিভাগের বাঙালি, সাবেক ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ ও রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী এবং বীর মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের রক্ত দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন, আজকের দিনে বাংলাদেশের জনগণের ভোটে নির্বাচিত বাংলাদেশ গণপরিষদ সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁদের স্মরণ করছে।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার যে ঘোষণা করেছিলেন এবং যে ঘোষণা মুজিবনগর থেকে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়েছিল, এই সঙ্গে গণপরিষদ তাতে একাত্মতা প্রকাশ করছে।

স্বাধীনতা সনদের মাধ্যমে যে গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল আজ সে সনদের সঙ্গেও এ পরিষদ একাত্মতা ঘোষণা করছে। প্রস্তাবটি গণপরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০-এ বিধান করা হয় যে, 'সংবিধানের অন্য কোনো বিধান সত্ত্বেও চতুর্থ তপশিলে বর্ণিত ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি কার্যকর হবে।' চতুর্থ তপশিলের অনুচ্ছেদ ৩(১)-এ উল্লেখ করা হয়, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হইতে এই সংবিধান প্রবর্তনের তারিখের মধ্যে প্রণীত বা প্রণীত বলিয়া বিবেচিত সকল আইন, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বা যে কোনো আইন হইতে আহরিত বা আহরিত বলিয়া বিবেচিত কর্তৃত্বের অধীন অনুরূপ মেয়াদের মধ্যে প্রযুক্ত সকল ক্ষমতা বা কৃত সকল কার্য এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল এবং তাহা আইনানুযায়ী যথাযথভাবে প্রণীত, প্রযুক্ত ও কৃত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল।"

২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর দ্বারা সংবিধানে অনুচ্ছেদ ১৫০ সংশোধন অর্থাৎ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত শেষে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা এবং ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার কর্তৃক জারীকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের ঐতিহাসিক ভাষণ ও দলিল উল্লেখে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ থেকে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর অর্থাৎ সংবিধান প্রবর্তন হওয়ার পূর্বপর্যন্ত সময়কালের জন্য ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এবং ওই ভাষণ ও দলিলগুলো সংবিধানে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম তপশিল হিসাবে সংযোজিত হয়েছে। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র' পনেরো খণ্ডের সিরিজ গ্রন্থের ২০০৪ সালের পুনর্মুদ্রণকৃত তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠায় মেজর জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন মর্মে বর্ণনা করা হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও চিকিৎসক এমএ সালাম ২০০৪ সালের পুনর্মুদ্রিত বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র গ্রন্থ সিরিজের তৃতীয় খণ্ডটি বাজেয়াপ্ত এবং বাংলাদেশ সৃষ্টির ইতিহাস বিকৃতকারীদের বিরুদ্ধে

যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। মাননীয় বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক এবং মাননীয় বিচারপতি মমতাজ উদ্দিন আহমেদের সমন্বয়ে গঠিত একটি দ্বৈত বেঞ্চ ওই রিট মোকদ্দমাটি শুনানি শেষে ২০০৯ সালের ২১ জুন এক রায়ে ২০০৪ সালে পুনর্মুদ্রিত 'বাংলাদেশ স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিল-পত্র'-এর তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠায় 'মেজর জিয়ার প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা' শিরোনামে মুদ্রিত বর্ণনা ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় এবং সাংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০-এর সঙ্গেও সাংঘর্ষিক এবং সংবিধানপরিপন্থি মর্মে ঘোষণা করেন; এবং উপরিউক্ত খণ্ডটি বাজেয়াপ্ত করার জন্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়। সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের ওই রায় সব কর্তৃপক্ষ ও ব্যক্তির জন্য অবশ্যপালনীয় এবং বাধ্যকর।

ইতিহাসের ঘটনাবলির ধারাবাহিকতায় সংবিধান, সংসদের কার্যবিবরণী এবং হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে কোনো বিতর্কের সুযোগ নেই। বাংলাদেশের মীমাংসিত বিষয় নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা দেশকে বারবার সংকটে ফেলার অপপ্রয়াস। এ কাজটি তারাই করে চলেছে, যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না, যারা স্বাধীনতাবিরোধী।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ, বাংলাদেশের ইতিহাস, স্বাধীনতা ঘোষণার এক অপরিহার্য অঙ্গ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া স্বাধীনতার ঘোষণা করার এখতিয়ার আর কারও ছিল না। কারণ, তিনি ছিলেন তৎকালীন জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের নির্বাচিত নেতা। জাতির পিতা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আমরা সেই দুর্ভাগা জাতির প্রমাণ দিচ্ছি।

বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে চলেছেন। বিশ্বের সামনে আজ বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল। ২০২১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘ দ্বিতীয়বার বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরের ঘোষণা দিয়েছে।

এখন প্রয়োজন দলমতনির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। রাজনীতি বা রাজনৈতিক দল যেন দেশের উন্নয়নে-শান্তিতে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হবে সব সমস্যার সমাধান–মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পেরিয়ে সব রাজনৈতিক দলের কাছে এটা দেশবাসীর প্রত্যাশা।

লেখক: সাবেক উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

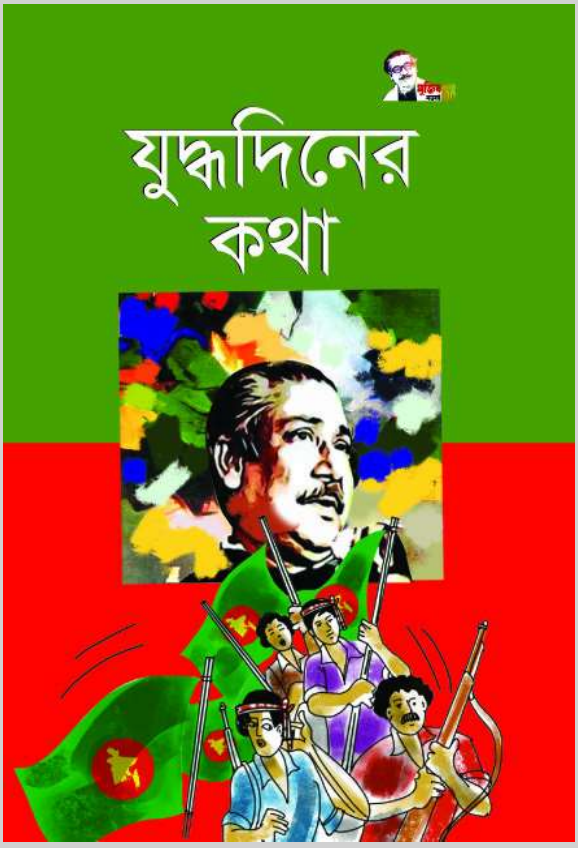

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির প্রতিফলন

ড. কামরুল হক

দীর্ঘ প্রায় ২৪ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই আন্দোলন-সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অনেক কঠিন ও রক্তাক্ত পথ পেরিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পথপরিক্রমা ছিল অত্যন্ত বন্ধুর। এই যুদ্ধে বাংলাদেশকে শুধু হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর মোকাবিলাই করতে হয়নি, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মতো বৃহৎ শক্তির কূটনৈতিক ও সামরিক শক্তির মহড়ার মোকাবিলা করতে হয়েছে। জটিল ভূরাজনৈতিক সমীকরণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মতো বন্ধুরাষ্ট্রের সহযোগিতাও লাভ করেছে।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের আগেই স্বাধীন দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে ভারত ও ভুটান স্বীকৃতি দিলেও বিজয় অর্জনের পর শিশুরাষ্ট্র হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন বাংলাদেশের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে আবির্ভূত হয়। দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম আর নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হওয়ার পর বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন ছাড়াও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের সামনে বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল দ্রুততম সময়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করা। নানা বাধাবিপত্তির পরও দেখা যায়, স্বাধীন হওয়ার চার বছরেরও কম সময়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হয়েছিল আর শতাধিক দেশের স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল।

সেসময়ের ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকৃতি আদায় করতে ভিন্ন এক বাস্তবতার মুখোমুখী হতে হয় বাংলাদেশকে। এর অন্যতম একটি কারণ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী বিশ্বব্যবস্থায় বাংলাদেশই প্রথম, যা উপনিবেশ থেকে স্বাধীন হওয়া কোনো দেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে

স্বাধীনতা অর্জন করে। যে কারণে বাংলাদেশের সরকারকে স্বাধীন দেশ হিসাবে নিজেকে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে জোর কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে হয়।

নানা কূটনৈতিক তৎপরাতায় বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করে। একে একে অনেক দেশই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তবে অনেক দেশের স্বীকৃতিপ্রাপ্তির বিষয়টি খুব মসৃণ ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী কিংবা পাকিস্তানের পক্ষের অনেক দেশ পরিস্থিতির কারণে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, কিছু দেশের স্বীকৃতি পাওয়া যায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যুর অব্যবহিত পর।

সংবাদপত্র প্রভাবশালী গণমাধ্যম। স্বাভাবিকভাবেই সংবাদপত্রে চলমান ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলন ঘটে। সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংবাদপত্রে গুরুত্বলাভ করে। স্বাধীনাতা অর্জনের অব্যবহিত পর থেকে শুরু করে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশকে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতিপ্রদান-সংক্রান্ত তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে কী পরিমাণ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল, উপস্থাপনপ্রবণতা কেমন ছিল, সম্পাদকীয় মতামতের মাধ্যমে স্বীকৃতিপ্রদান ইস্যুতে সংবাদপত্রগুলো কী ভূমিকা রেখেছিল–এসব গবেষণা-সমস্যা ও প্রেক্ষাপট সামনে রেখে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) থেকে একটি গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়।

তিনটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে এ গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়: এক. সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলন যাচাই করা। দুই. সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবরের উপস্থাপনপ্রবণতা বিশ্লেষণ করা। তিন. সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ করা।

এ গবেষণাকর্মের জন্য আধেয় বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণাকর্মের আওতাধীন সময় ছিল ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এ গবেষণাকর্মের জন্য স্বেচ্ছাচয়িত নমুনায়ন (Purposive Sampling) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। দুই ধাপে নমুনা বাছাই করা হয়। প্রথম ধাপে চারটি সংবাদপত্রকে নমুনা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। সংবাদপত্র চারটি হচ্ছে: এক. দৈনিক ইত্তেফাক; দুই. সংবাদ; তিন. দৈনিক পাকিস্তান/দৈনিক বাংলা; চার. পাকিস্তান অবজারভার/বাংলাদেশ অবজারভার। উল্লেখ করা যেতে পারে, দেশ স্বাধীনের পর 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকাটি 'দৈনিক বাংলা' নামে প্রকাশনা শুরু করে। আর 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকাটি 'বাংলাদেশ অবজারভার' নামে প্রকাশনা শুরু করে।

এ সংবাদপত্রগুলো বাছাই করার কারণ হচ্ছে, দেশ স্বাধীনের অব্যবহিত পরে এ সংবাদপত্রগুলোই প্রভাবশালী ও শীর্ষস্থানীয় ছিল। চারটি সংবাদপত্রের সবকটি জাতীয় দৈনিকের মর্যাদাসম্পন্ন এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত। দৈনিক বাংলা কিছুটা নবীন হলেও বাকি তিনটি সংবাদপত্র বেশ প্রাচীন। স্বাধীনতাপূর্বকালে ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে এই সংবাদপত্র চারটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গবেষণাকর্মের আওতাভুক্ত সময়ে বাংলাদেশের গোটা পত্রিকামাধ্যমকে মোটামুটি প্রতিনিধিত্ব করেছে এ সংবাদপত্রগুলো।

দ্বিতীয় ধাপে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের উপরিউক্ত চারটি সংবাদপত্রকে নমুনাভুক্ত করা হয়েছে। তবে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে চারটি সংবাদপত্রের সব কপি পাওয়া যায়নি। তাই সব কপি বিশ্লেষণের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। ১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ সংবাদ পত্রিকার অফিস হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী পুড়িয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধকালে সংবাদ আর প্রকাশিত হয়নি। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ৯ জানুয়ারি থেকে সংবাদ প্রকাশনা শুরু করে। কিন্তু ৯ জানুয়ারির সংবাদের কোনো কপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তাই সংবাদ পত্রিকার ১০ জানুয়ারি থেকে প্রকাশিত কপি এই গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরপর ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন থেকে ১৯৭৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত সংবাদের প্রকাশনা বন্ধ থাকে। তাই সংবাদ পত্রিকা বন্ধ থাকার দিনগুলোকে নমুনার আওতাভুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

এ গবেষণাকর্মের আওতাধীন সময়ে সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ঘটনাপ্রবাহ প্রতিফলিত হয়েছে। যাচাই করে দেখা যায়, ভারত ও ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশের আগেই। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হওয়ার ১০ দিন আগে ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। আর ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের ৯ দিন আগে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। পরদিন ৭ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। আর ভুটান স্বীকৃতি দেয় ৭ ডিসেম্বর। এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ৮ ডিসেম্বর। বিজয় অর্জনের ২৫ দিন পর ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিটি আসে। আর এই স্বীকৃতিটি দেয় পূর্ব জার্মানি। পরদিন ১২ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। শেষ স্বীকৃতিটি আসে চীনের কাছ থেকে ১৯৭৫ সালের ৩১ আগস্ট। এই খবর প্রকাশিত হয় ১ সেপ্টেম্বর।

এ দীর্ঘ সময়সীমায় শুধু বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি দেওয়ার খবরই নয়, স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট নানা ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছে। অনেক খবর দীর্ঘদিন ধরে ফলোআপ করা হয়েছে। কিছু খবরের ক্ষেত্রে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়।

গবেষণাকর্মের আওতাধীন চারটি সংবাদপত্রে মোট ৩৭১টি স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবর প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে দৈনিক ইত্তেফাকে সবচেয়ে বেশি খবর (১১৩টি) প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থান সংবাদের (৯৭টি)। তৃতীয় অবস্থান দৈনিক বাংলার (৯০টি)। চতুর্থ অবস্থান বাংলাদেশ অবজারভারের (৭১টি)।

সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবরের উপস্থাপনপ্রবণতা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, খবরগুলো উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বলাভ করেছিল। কারণ, স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট বেশির ভাগ খবরই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি সংবাদপত্রেই এই প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। তবে দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় খবর প্রকাশের হার সবচেয়ে বেশি (৯৬ শতাংশ)। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল বাংলাদেশ অবজারভার (৯৪ শতাংশ)। তৃতীয় অবস্থানে ছিল সংবাদ (৯১ শতাংশ) এবং চতুর্থ অবস্থানে দৈনিক ইত্তেফাক (৮৪ শতাংশ)। এখানে লক্ষণীয়, দৈনিক ইত্তেফাকে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক খবর প্রকাশিত হলেও এই সংবাদপত্রে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশের হার অন্য তিনটি সংবাদপত্রের তুলনায় কম।

বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়, খবরের কলামভিত্তিক উপস্থাপন অনুযায়ীও স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবরগুলো সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কলামভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ীও স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবর দৈনিক বাংলাই তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম

স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের সমর্থন লাভের চেষ্টা শুরু করে। স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশের পর তা আরও গুরুত্বলাভ করে

শিরোনাম থেকে শুরু করে ৮ কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত খবরের হার যাচাই করে এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। তবে অন্য তিনটি সংবাদপত্রও খুব বেশি পিছিয়ে ছিল না। শুধু আট কলাম ব্যানার খবর প্রকাশের ক্ষেত্রেও তা দেখা গেছে। তবে সংবাদ আট কলাম ব্যানার শিরোনামে কোনো খবর প্রকাশ করেনি।

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের পর পাঁচ বৃহৎ শক্তির দেশ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও চীনের স্বীকৃতি অর্জন বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি। সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বীকৃতি দেওয়ার ১০ দিন পর ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ড স্বীকৃতি দেওয়ার সাতদিন পর তৃতীয় দেশ হিসাবে ১৯৭২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি স্বীকৃতি দেয় ফ্রান্স। এর প্রায় দুই মাস পর ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় সব শেষে ১৯৭৫ সালের ৩১ আগস্ট। পাঁচ বৃহৎ শক্তির দেশগুলোর স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবরও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বলাভ করেছিল। খবরগুলোর বেশির ভাগই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই পাঁচ বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের খবরের হার ছিল সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল চীনের স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবর।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হলেও পাকিস্তান বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশবিরোধী কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখে এবং স্বীকৃতিদানে বিলম্ব করতে থকে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে প্রভাবিত করারও অপচেষ্টা চালায়। এ কারণে অনেক দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বিলম্বও করে। অনেক টালবাহানার পর ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। পাকিস্তান স্বীকৃতি দেওয়ার আগে ও পরে দীর্ঘদিন স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক খবর প্রকাশিত হয়। আর খবরগুলো উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বলাভ করেছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের সমর্থন লাভের চেষ্টা শুরু করে। স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশের পর তা আরও গুরুত্বলাভ করে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরেই বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত করার জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের সদস্যভুক্তির জন্য আবেদন জানানো হয় ১৯৭২ সালের ৮ আগস্ট। কিন্তু ১৯৭২ সালের ২৫ আগস্ট জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির বিরুদ্ধে চীন ভেটো দেয়। পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষার জন্যই চীন এই ভেটো দেয়। যে কারণে সেসময় বাংলাদেশের জাতিসংঘে সদস্যভুক্ত হওয়া সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হয় আরও দুবছর পর। ১৯৭৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত করা হয়। জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয় বাংলাদেশকে। গবেষণার আওতাধীন সময়ে সংবাদপত্রে বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্ত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছিল। খবরগুলো উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্ব পেয়েছিল।

এ গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবর বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল বলেই সংবাদপত্রগুলোয় এ সম্পর্কে একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণাধীন সংবাদপত্রগুলোয় ৪৫টি সম্পাদকীয় প্রকাশ হয়। এর মধ্যে দৈনিক বাংলায় ১৫টি, দৈনিক ইত্তেফাকে ১২টি, বাংলাদেশ অবজারভারে ১০টি এবং সংবাদে ৭টি সম্পাদকীয় ছিল। এতে প্রতীয়মান হয়, স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবর ও ঘটনাপ্রবাহ সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল বলেই সম্পাদকীয়গুলো প্রকাশিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের অব্যবহিত পর থেকেই বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ, দিকনির্দেশনা, মন্তব্য ও অভিমত জানিয়ে সংবাদপত্রগুলো সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে। আশা প্রকাশ করে, স্বীকৃতির ধারাবাহিকতায় দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে।

সংবাদপত্রগুলোর কাছে প্রতীয়মান হয়, বিশ্বজনমত বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও পাকিস্তান বাংলাদেশবিরোধী অপতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। তাই এ সম্পর্কে সজাগ থাকার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর থেকে সংবাদপত্রগুলো বাংলাদেশের বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন সময় পাকিস্তানের প্রতি আহ্বান জানায়। সম্পাদকীয়গুলোয় আশা প্রকাশ করা হয়, শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে পাকিস্তান দ্রুত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। অন্যথায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিয়ে পাকিস্তানের অস্তিত্বই হুমকির মধ্যে পড়বে বলে

পাকিস্তানকে হুঁশিয়ার করা হয়। কিন্তু পাকিস্তান নানা টালবাহানার আশ্রয় নেয়। অন্যান্য দেশকেও স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করতে থাকে। তবে ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর সংবাদপত্রগুলো পাকিস্তানের স্বীকৃতিকে সত্য ও বাস্তবতার জয় এবং বাংলাদেশের নৈতিক ও কূটনৈতিক বিজয় হিসাবে অভিহিত করে।

সংবাদপত্রগুলো সম্পাদকীয়তে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করার জন্য পরামর্শ দেয় সরকারকে। আবার মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের জন্যও পরামর্শ দেয়।

আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রথম ইরাক ১৯৭২ সালের ৮ জুলাই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অভিহিত করে সংবাদপত্রগুলো। এই স্বীকৃতিকে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে পরিবর্তনের প্রতীক হিসাবে অভিহিত করা হয় এবং আশা প্রকাশ করে–খুব দ্রুত আরববিশ্বের অন্যান্য দেশও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। এই আশাবাদ বাস্তবে রূপ নেয় যখন ইয়েমেন, লেবানন, মরক্কো, মিশর, সিরিয়াসহ বিভিন্ন আরব রাষ্ট্র একে একে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

পাঁচ বৃহৎ শক্তির দেশগুলোর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে সরাসরি সমর্থন ও সহযোগিতা করেছিল। তাই ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে সংবাদপত্রগুলো একে খুবই প্রত্যাশিত মনে করে এবং আশা প্রকাশ করে–আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যথাযথ স্থানলাভ এবং বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। এর প্রভাব অবশ্যই পড়েছিল। এমনকি বৃহৎ শক্তির দেশগুলোর মধ্যেও এর প্রভাব লক্ষণীয়। বৃহৎ শক্তি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বীকৃতি দেওয়ার মাত্র ১০ দিন পরই ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ড বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। আর ফ্রান্স স্বীকৃতি দেয় ইংল্যান্ডের সাতদিন পর ১৯৭২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি। এমনকি যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশবিরোধী অবস্থান নিলেও সোভিয়েত স্বীকৃতির পর তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতির পর সংবাদপত্রগুলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দেশটির ন্যক্কারজনক বিরোধিতার কথা স্মরণ করে এবং এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের ব্যাপারে মার্কিন জনমতেরই বিজয় ঘটেছে বলে অভিমত প্রকাশ করে।

তবে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তি চীন ব্যতিক্রম। মুক্তিযুদ্ধের সময় চীন পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেছিল। স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশের পরও চীন বাংলাদেশবিরোধী অবস্থানে অটল থাকে। শুধু তাই নয়, চীন শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মর্মান্তিকভাবে নিহত হওয়ার পর। দুঃখজনক হলেও সত্য, ১৯৭৫ সালের ৩১ আগস্ট চীন স্বীকৃতি দিলে সংবাদপত্রগুলো এটিকে খন্দকার মোশতাক আহমেদের সরকারের সাফল্য হিসাবে বর্ণনা করে। এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক তৎপরতার ধারাবাহিকতার বিষয়টিও সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকীয়তে প্রতিফলিত হয়নি।

অথচ জাতিসংঘের সদস্যভুক্তির ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু যখন উদ্যোগী হন এবং চীন জাতিসংঘে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভেটো দেয়, তখন সংবাদপত্রগুলো জাতিসংঘে চীনের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে এবং চীনের এই ভূমিকাকে জাতিসংঘের ইতিহাসে কলঙ্কজনক দৃষ্টান্ত অভিহিত করে। আর ১৯৭৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত হওয়ার পর সংবাদপত্রগুলো জাতির এই মর্যাদা অর্জনকে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ অভিহিত করে সংবাদপত্রগুলো। এজন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানকে গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণও করে। প্রকৃতপক্ষে চীনের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নীরব কূটনৈতিক তৎপরতার ফলেই এই অর্জন সম্ভব হয়েছিল। জাতিসংঘে চীনের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি।

স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট প্রকাশিত খবরের ধারাবাহিকতায় কিছু পর্যবেক্ষণ:

বিজয়ের আগেই ভারত ও ভুটানের স্বীকৃতি

বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় সূচিত হয় এই দিন। এরপর একে একে বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে থাকে। তবে ভারত ও ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের আগেই। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হওয়ার ১০ দিন আগে ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। ভুটানও ভারতের অনুগামী হয়। ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের ৯ দিন আগে।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, ভারত বাংলাদেশকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দেয়। দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর। পরদিন ৭ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হাতে অবরুদ্ধ। সংবাদপত্রগুলো ছিল মূলত পাকিস্তান সরকারের অপপ্রচার আর প্রোপাগান্ডার বাহন। তাই স্বাভাবিকভাবেই ভারতের স্বীকৃতির খবরে স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট তথ্যটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বরং গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে স্বীকৃতির প্রতিক্রিয়ার তথ্যকে। প্রতিক্রিয়াটি ছিল: ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার কারণে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি সংবাদপত্রের মধ্যে এ সময় সংবাদের প্রকাশনা বন্ধ ছিল। বাকি তিনটি সংবাদপত্র খবরটিকে আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'পাক-ভারত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন'। পাকিস্তান অবজারভারের শিরোনাম ছিল: 'Pakistan breaks with India'। আর দৈনিক পাকিস্তানের (স্বাধীনতার পর দৈনিক বাংলা) শিরোনাম ছিল: 'তথাকথিত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ায় ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ব্যবস্থা : কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন'। এখানে লক্ষণীয়, শিরোনামে দৈনিক পাকিস্তান বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতির প্রসঙ্গ তুলে ধরা হলেও দৈনিক ইত্তেফাক এবং পাকিস্তান অবজারভার শিরোনামে স্বীকৃতির বিষয়টি আনেনি।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, ভারতের পর ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর। পরদিন ৮ ডিসেম্বর খবরটি দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক পাকিস্তান প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: "ভুটান কর্তৃক 'বাংলাদেশ'কে স্বীকৃতিদান"। দৈনিক পাকিস্তানের শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে ভুটানের স্বীকৃতিদান'। এখানে লক্ষণীয়, খবরটি ভারতের স্বীকৃতির খবরের তুলনায় অনেক কম গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হলেও শিরোনামে সরাসরি স্বীকৃতির তথ্যটিই পরিবেশিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর ১০ দিনের আলটিমেটাম ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী অবস্থানে ছিল। বাংলাদেশ যাতে স্বাধীন দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে না পারে, সেজন্য যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিক ও সামরিক অপতৎপরতার পাশাপাশি পাকিস্তানকে নানাভাবে

সমর্থন জুগিয়েছে। এমনকি বাংলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশের পরও তারা বাংলাদেশবিরোধী অবস্থানে অটল থাকে এবং পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে বিভিন্ন নেতিবাচক কর্মকাণ্ড চালায়।

এ প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালের এপ্রিলে এসে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান নেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭২ সালের ৩ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু ১০ দিনের মধ্যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সময় বেঁধে দেন যুক্তরাষ্ট্রকে। অন্যথায় তিনি ঢাকা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস গুটিয়ে নিতে বলেন। ৪ এপ্রিল এই খবর সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। বঙ্গবন্ধুর আলটিমেটাম ঘোষণার পরদিনই অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি কূটনৈতিক বিজয়। বিপরীতদিকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতির একটা কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। কারণ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানকে সামরিক সরঞ্জাম এবং অর্থনৈতিক সাহায্য-সহযোগিতা করে নিক্সন সরকার। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে সে দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ, সংবাদপত্র ও রাজনীতিবিদরা। বাংলাদেশ শত্রুকবলমুক্ত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ, সেদেশের সংবাদপত্র, কংগ্রেস এবং সিনেটররা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ক্রমাগত নিক্সন সরকারকে চাপ দিয়ে আসছিল।

১৯৭২ সালের ২৫ মার্চ মার্কিন সিনেটে বাংলাদেশকে যত দ্রুত সম্ভব স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরে এ প্রস্তাবটি সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটিতে ভোটের মাধ্যমে পাশ করা হয়। প্রস্তাবটির বিপক্ষে একটিও ভোট পড়েনি।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আলটিমেটাম দেওয়ার পর ঘোষিত হয় এই স্বীকৃতি।

বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ৫টি স্থায়ী সদস্যের মধ্যে ৪টির স্বীকৃতি পাওয়া যায়। নিরাপত্তা পরিষদের অন্য তিনটি স্থায়ী সদস্য দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্রের আগেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এই স্বীকৃতির ফলে বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার পথে অন্যতম অন্তরায় অপসারিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতিপ্রাপ্তির পর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মার্কিন স্বীকৃতির খবরে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আশা প্রকাশ করেন, এর মাধ্যমে দুদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

স্বীকৃতি দেওয়ার পর বাংলাদেশ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন সরকারের নীতির কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ১৯৭৩ সালের ৩ মে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে বার্ষিক পররাষ্ট্রনীতি রিপোর্ট পেশ করার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রতি উপমহাদেশের নতুন বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানান। এদিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন বাংলাদেশের সাফল্য ও স্থিতিশীলতায় তার সরকারের আগ্রহের কথাও উল্লেখ করেন।

পাকিস্তানের স্বীকৃতি: বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক বিজয়

পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায় ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য একটি বিরাট কূটনৈতিক সাফল্য। মহান মুক্তিযুদ্ধে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী পরাজিত হওয়ার পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে নানা টালবাহানা শুরু করে। স্বীকৃতির জন্য বিভিন্ন পূর্বশর্ত জুড়ে দেয়। ভুট্টো বারবার দাবি জানাতে থাকে–বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আগে তিনি পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তি এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যকার অন্যান্য বিষয় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় বসতে চান। ১৯৭২ সালের শুরু থেকেই ভুট্টো এই দাবি করে আসছিলেন। বেশকিছু মুসলিম রাষ্ট্র ও চীন ভুট্টোর এই দাবির সমর্থকও ছিল। ভুট্টোকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কোনো কোনো রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বিলম্বও করে।

> বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ৫টি স্থায়ী সদস্যের মধ্যে ৪টির স্বীকৃতি পাওয়া যায়। নিরাপত্তা পরিষদের অন্য তিনটি স্থায়ী সদস্য দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্রের আগেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়

কিন্তু শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আগে ভুট্টোর সঙ্গে কোনো আলোচনা করার সম্ভাবনা নাকচ করে দেন এবং এই সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। ভুট্টো বারবার আলোচনায় বসার প্রস্তাব দেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু স্বীকৃতির আগে আলোচনা না করার কথা পুনর্ব্যক্ত করতে থাকেন। বঙ্গবন্ধু অনুধাবন করতে পেরেছিলেন–পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানে বাধ্য হবে। আর স্বীকৃতিদানে বিলম্ব করলে বাংলাদেশের কোনো ক্ষতি হবে না। বরং পাকিস্তানই বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হবে।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানে ভুট্টোর ছলচাতুরী চলে দীর্ঘদিন। এ সময় পাকিস্তানের কিছু রাজনৈতিক দল বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের পক্ষে তাদের অভিমত তুলে ধরে। এ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ছিল: পাকিস্তান জমিয়তে ওলেমায়ে ইসলাম, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, পাকিস্তান কংগ্রেস দল এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বিভিন্ন শাখা। পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের স্ত্রী-সন্তানরাও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সামনে বিক্ষোভ করে। পাকিস্তানের প্রভাবশালী সংবাদপত্রগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে সমর্থন জানিয়ে তাদের মতামত তুলে ধরে। এ সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে ডেইলি ডন, পাকিস্তান টাইমস, দৈনিক জং উল্লেখযোগ্য। এমনকি জুলফিকার আলী ভুট্টোর রাজনৈতিক দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির মুখপত্র 'মুসাওয়াত'ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতির পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে।

১৯৭৩ সালে এসে জুলফিকার আলী ভুট্টো কিছুটা অনুভব করতে পারেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্ন দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রাখায় পাকিস্তান প্রতিকূল পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে। তিনি স্বীকার করেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিষয়টি বিলম্বিত করার কারণে বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক বোঝা পাকিস্তানের কাঁধে চাপছে। বৈদেশিক ঋণের বাংলাদেশের অংশ

পাকিস্তানকেই পরিশোধ করতে হচ্ছে। পাকিস্তানি ব্যবসায়ীরাও পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সংকট মোচনের জন্য বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ভুট্টোকে পরামর্শ দেন। শুধু তাই না, বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্নে পাকিস্তানের অবস্থানের ব্যাপারে ১৯৭৩ সালের জুনে চীনও পরিবর্তিত ভূমিকা গ্রহণ করে। এ সময় পাকিস্তান সফরকালে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে নমনীয় হওয়ার জন্য জুলফিকার আলী ভুট্টোকে পরামর্শ দেন। এর পরপরই ১৯৭৩ সালের ১০ জুলাই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ভুট্টোকে ক্ষমতা দিয়ে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। কিন্তু তারপরও ভুট্টো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আগে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় বসার ইচ্ছা পোষণ করে আরও কালক্ষেপণ করতে থাকেন।

১৯৭৪ সালে এসে পাকিস্তান ভিন্ন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এ বছরই ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠাতব্য ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনের নির্ধারিত স্থান ছিল পাকিস্তানের লাহোর নগরী। এই সম্মেলনে বাংলাদেশকে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, পাকিস্তান স্বীকৃতি না দিলে এই সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করবে না। বঙ্গবন্ধুর এই দৃঢ় অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আলজেরিয়া, মিশরসহ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ সৃষ্টির জন্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলো বিশেষ করে মিশর, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়।

শেষ পর্যন্ত কূটনৈতিক পরাজয় ঘটে পাকিস্তানের। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর সব দম্ভ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে নিঃশর্ত স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। বিপরীতদিকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায়ের ক্ষেত্রে কূটনৈতিক বিজয় অর্জন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায়ের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ও সাফল্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর নীরব কূটনীতি: চীনের ভেটো ও জাতিসংঘে বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জোরালো কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে ১৯৭২ সালের আগস্টের আগেই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ৫টি সদস্যের মধ্যে একমাত্র চীন ছাড়া অপর ৪টি দেশ এবং নিরাপত্তা পরিষদের ১৫টি অস্থায়ী সদস্যের মধ্যেও ১১টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এ প্রেক্ষাপট সামনে রেখে ১৯৭২ সালের ৮ আগস্ট বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করে। লক্ষ্য ছিল–সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠাতব্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যাতে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। কোনো ত্রুটি না রাখার জন্য বাংলাদেশ তিনটি প্রক্রিয়ায় আবেদনপত্র পাঠায়। প্রথম প্রক্রিয়াটি ছিল: জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল কুর্ট ওয়াল্ডহেইমের কাছে সরাসরি তারবার্তার মাধ্যমে আবেদনপত্র পাঠানো হয়। দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি ছিল: ঢাকাস্থ জাতিসংঘ প্রতিনিধি ড. উমব্রিখটের মাধ্যমেও আবেদনপত্র পাঠানো হয়। আর তৃতীয় প্রক্রিয়া হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এসএ করিমের মাধ্যমেও আবেদনপত্র পাঠানো হয়। পাশাপাশি জাতিসংঘের সদস্য সব রাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভে সমর্থনদানের জন্য চিঠি পাঠানোসহ কূটনৈতিক চ্যানেলেও যোগাযোগ করা হয়।

কিন্তু পাকিস্তানের প্ররোচনার কারণে চীন চাইছিল না বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হোক। মুক্তিযুদ্ধের সময়ও চীন বাংলাদেশের পক্ষে ছিল না। বরং পক্ষে ছিল পাকিস্তানের। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী যখন বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছিল, তখন চীন শুধু তা সমর্থনই করেনি, সর্বতোভাবে সাহায্যও করেছে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর আশা করা হয়েছিল চীন তার ভুল বুঝতে পারবে। তার ভ্রান্তনীতি ত্যাগ করবে। কিন্তু চীন বাংলাদেশবিরোধী অবস্থান থেকে সড়ে আসেনি। এমনকি পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষার জন্য ১৯৭২ সালের ২৫ আগস্ট নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির বিরুদ্ধে চীন ভেটো দেয়। এই ভেটোর মাধ্যমে জাতিসংঘে সদস্যপদ লাভে বাংলাদেশের ন্যায়সংগত অধিকারের বিরোধিতা করে চীন প্রমাণ করে, সে পাকিস্তানের সামন্ততান্ত্রিক ও জঙ্গি সরকারেরই সমর্থক। যে পাকিস্তান উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে বারবার অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।

১৯৭২ থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশ আর জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত হতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, পাকিস্তানের প্ররোচনায় চীন তার ভেটো দেওয়া অব্যাহত রাখবে। তবে সেজন্য তিনি হতাশ হননি। বরং নীরব কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এর অংশ হিসাবে তিনি অভিজ্ঞ কূটনীতিক কেএম কায়সারকে চীনে পাঠান। কেএম কায়সার আগে চীনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজ করেছিলেন। তিনি তার কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা ও চীনের কূটনৈতিক মহলে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কৌশলে কাজে লাগান এবং পাকিস্তানকে অন্ধকারে রেখে জাতিসংঘে চীনের সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হন। তাই ১৯৭৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশকে যখন জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয়, তখন চীন আর বাধা হয়ে উঠেনি।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর স্বীকৃতি

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড এবং পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর গুরুত্বপূর্ণ দুটি দেশের স্বীকৃতিলাভ করে বাংলাদেশ। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে এক নির্মম ও কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটে যায়। এই দিন সেনাবাহিনীর একদল ক্ষমতালিপ্সু অফিসারের হাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন। সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্ক ডিভিশনের বেশ কয়েকজন সামরিক অফিসার মহড়ার কথা বলে গভীর রাতে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর নিজস্ব বাসভবনে আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে। এই পৈশাচিক ঘটনায় নিহত বঙ্গবন্ধুর লাশ দাফনের আগেই আওয়ামী লীগ নেতা খন্দকার মোশতাক আহমেদ নতুন প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করে। গঠিত হয় নতুন সরকার। হতবিহ্বল হয়ে পড়ে বাঙালি জাতি। বিস্মিত হয় বিশ্ববাসী।

এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরই ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট আরববিশ্বের প্রভাবশালী দেশ সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। প্রধান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সৌদি আরবই সব শেষে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। মুসলিমবিশ্বে সৌদি আরব ছিল পাকিস্তানের অন্যতম সুহৃদ রাষ্ট্র। মুসলিম ভ্রাতৃত্বের প্রভাব খাটিয়ে সৌদি আরব যাতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানে বিরত থাকে, সে চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল পাকিস্তান। শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর অন্তর্ধানের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পাকিস্তানের অনুকূলে এলে সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

পাকিস্তানের অপর সুহৃদ রাষ্ট্র চীনের স্বীকৃতিও আসে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর। সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার দুই সপ্তাহ পর ১৯৭৫ সালের ৩১ আগস্ট চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

যদিও পাকিস্তানের এ দুই সুহৃদ রাষ্ট্র সৌদি আরব ও চীনের স্বীকৃতিপ্রাপ্তির এক বছরেরও বেশি আগে ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল। আর পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায় করা ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কূটনৈতিক সাফল্যের এক মাইলফলক।

পাকিস্তানি বাধা ও মুসলিম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি

বিশ্বজনমত বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও পাকিস্তানের বাংলাদেশবিরোধী অপতৎপরতা মুসলিম দেশগুলোর স্বীকৃতিপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছিল। তবে ধীরে ধীরে সে বাধা দূর হতে থাকে। মুসলিম দেশগুলোর স্বীকৃতি আসতে থাকে।

পাকিস্তানি বাধা প্রথম অতিক্রম করে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর আলোচনা না হওয়া পর্যন্ত এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য পাকিস্তান ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াকে অনুরোধ করে আসছিল। কিন্তু পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আগে ভুট্টোর সঙ্গে কোনো আলোচনা না করার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন বঙ্গবন্ধু। শেষ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া বঙ্গবন্ধুর নীতিগত অবস্থানই সমর্থন করে এবং পাকিস্তানের অনুরোধ অগ্রাহ্য করেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত নেয়। মালয়েশিয়াও একই পথ অবলম্বন করে। ইন্দোনেশিয়ার স্বীকৃতিদান প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে। ফেব্রুয়ারির শুরু থেকেই বেশ কয়েকবার এই দেশের স্বীকৃতির সিদ্ধান্তসংক্রান্ত খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তবে চূড়ান্তভাবে স্বীকৃতিটি আসে ১৯৭২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি। একই দিন অপর মুসলিম দেশ মালয়েশিয়াও স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশকে।

সেসময় জনসংখ্যার দিক দিয়ে ইন্দোনেশিয়া ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম দেশ। মুসলিম জনসংখ্যানুপাতে বাংলাদেশ ছিল পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ।

ইংল্যান্ডের স্বীকৃতি ও পাকিস্তানের কমনওয়েলথ ত্যাগ

১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি কমনওয়েলথভুক্ত দেশ ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পরদিনই অর্থাৎ ৩১ জানুয়ারিতেই অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। আর ইংল্যান্ড স্বীকৃতি দেয় ৪ ফেব্রুয়ারি। এই তিনটি দেশই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্তের কথা পাকিস্তানকে জানিয়ে দেয়। বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনার জন্য কমনওয়েলথ সেক্রেটারি জেনারেল আর্নল্ড স্মিথ রাওয়ালপিন্ডি যান। কিন্তু আর্নল্ড স্মিথ রাওয়ালপিন্ডি যাওয়ার পরপরই পাকিস্তান কমনওয়েলথ ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। উল্লিখিত তিনটি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ হিসাবেই কমনওয়েলথের সঙ্গে ২৪ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করে পাকিস্তান, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

স্বাধীনতার পর থেকেই পাকিস্তান হুমকি দিচ্ছিল–বাংলাদেশকে যে রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেবে, পাকিস্তান তাদের সঙ্গেই সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এমন ঘটনাও ঘটছিল। একইভাবে কমনওয়েলথ ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো আগেই হুমকি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ইংল্যান্ড বা কমনওয়েলথের অন্য কোনো সদস্য দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে পাকিস্তান কমনওয়েলথ ত্যাগ করবে। শেষ পর্যন্ত তা ঘটিয়েছিল পাকিস্তান।

ইউরোপীয় সাধারণ বাজারভুক্ত রাষ্ট্রের স্বীকৃতি

১৯৭২ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারির মধ্যে ইউরোপের মোট ২২টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এর মধ্যে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারভুক্ত সব দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ড ও পশ্চিম জার্মানির স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারভুক্ত দেশগুলোর স্বীকৃতিপ্রাপ্তি শুরু হয়। ১৯৭২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস ও লুক্সেমবার্গ স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশকে। পরদিন ১২ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্স ও ইতালির স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারভুক্ত সব দেশের স্বীকৃতি আসে।

লক্ষণীয়, ইউরোপীয় সাধারণ বাজারভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বৃহৎ শক্তির দেশ ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সও রয়েছে। তাই বৃহৎ দুটি শক্তির দেশ ছাড়াও ইউরোপীয় অর্থনৈতিকসমৃদ্ধ দেশগুলোর স্বীকৃতি বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। পাশাপাশি প্রভাবশালী দেশগুলোর স্বীকৃতি অন্য রাষ্ট্রগুলোকে বাংলাদেশের প্রতি স্বীকৃতিদানে অনুপ্রাণিত করে।

ওয়ারশ জোটভুক্ত রাষ্ট্রের স্বীকৃতি

১৯৭২ সালের জুনের মধ্যে সেসময় ওয়ারশ জোটভুক্ত দেশগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এর মধ্যে ছয়টি দেশ ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারির মধ্যে স্বীকৃতি দেয়। স্বাধীন দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় পূর্ব জার্মানি, যা ওয়ারশ জোটভুক্ত দেশ। অন্য দেশগুলোর মধ্যে বুলগেরিয়া ও পোল্যান্ড ১২, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়া ২৪ এবং হাঙ্গেরি ২৮ জানুয়ারি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। সবশেষে ১৯৭২ সালের ২৮ জুন স্বীকৃতি দেয় রুমানিয়া।

১৯৫৫ সালের ১৪ মে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুসারী মধ্য ও পূর্ব ইউররোপের আটটি কমিউনিস্ট দেশ ওয়ারশ জোটের অন্তর্ভুক্ত হয়। দেশগুলো হচ্ছে: সোভিয়েত ইউনিয়ন, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, পূর্ব জার্মানি, রোমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও আলবেনিয়া। আলবেনিয়া ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এই জোটভুক্ত ছিল। উল্লিখিত দেশগুলোর নিরাপত্তা সুদৃঢ় করা এবং যুক্তরাষ্ট্রের মদতপুষ্ট ন্যাটো, সিয়াটোসহ অন্যান্য সামরিক শক্তি জোটের প্রতিপক্ষ হিসাবে সংস্থাটি গঠিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও সেসময়ের ওয়ারশ জোটভুক্ত দেশগুলোর সমর্থন ছিল।

আসিয়ানভুক্ত রাষ্ট্রের স্বীকৃতি

দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতি সংস্থা (Association of Southeast Asian Nations) বা আসিয়ান-এর সদস্যভুক্ত দেশগুলোর স্বীকৃতিলাভের মাধ্যমে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সম্পর্কোন্নয়নের সুযোগ লাভ করে বাংলাদেশ। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশও এশিয়া অঞ্চলের একটি দেশ। স্বাধীন দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর পঞ্চম দেশ হিসাবে আসিয়ানভুক্ত দেশ মিয়ানমার (সেসময়ের নাম বার্মা) বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। নিকট প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের স্বীকৃতি পাওয়া যায় ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি। এরপর থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াসহ আসিয়ানভুক্ত অন্য দেশগুলোর স্বীকৃতি আসে। আসিয়ানের প্রভাবশালী দেশগুলোর স্বীকৃতি পাওয়া যায় ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যেই।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১০টি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত সংস্থা আসিয়ান। ১৯৬৭ সালের ৮ আগস্ট ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড দ্বারা সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ব্রুনাই, কম্বোডিয়া, লাওস, মিয়ানমার এবং ভিয়েতনাম সদস্যপদ লাভ করে।

এই সংস্থার লক্ষ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অগ্রগতি, সাংস্কৃতিক বিবর্তন তার সদস্যদের মধ্যে ত্বরান্বিত করা, আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা সুরক্ষা এবং সদস্য দেশগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে মতপার্থক্য নিয়ে আলোচনা ও সমাধান করা। তাই এ সংস্থার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর স্বীকৃতিপ্রাপ্তি বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়।

প্রথম আরব রাষ্ট্রের স্বীকৃতি: ইরাক প্রথম

নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ক্ষেত্রে ইরাক মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম আরব মুসলিম রাষ্ট্র এবং বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে তৃতীয়। ১৯৭২ সালের ৮ জুলাই ইরাকের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। ইরাকের স্বীকৃতি স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কূটনৈতিক সাফল্য। এ স্বীকৃতিকে সেসময় মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে পরিবর্তনের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

স্বাধীনতাসংগ্রামকালে বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সহযোগিতা পায়নি। তারা পাকিস্তানি শাসকচক্রকে সমর্থন দিয়েছে। ইরাকও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। সেসময় কুচক্রী পাকিস্তানি শাসকচক্র বাংলাদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম আরব রাষ্ট্র ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের বিপক্ষে মিথ্যা, বিদ্বেষপূর্ণ ও বিরূপ তথ্য প্রচার করে। এমনকি স্বাধীনতা অর্জনের পরও পাকিস্তানি অপতৎপরতা অব্যাহত ছিল।

তবে শেষ পর্যন্ত যে আরববিশ্বে বাংলাদেশ সরকারের কূটনৈতিক বিজয় সূচিত হতে শুরু করে, তার নজির ইরাকের স্বীকৃতি। এর মাধ্যমে আরববিশ্বে বাংলাদেশবিরোধী মিথ্যা প্রচারের বিষবাষ্প অপসারিত হতে শুরু করে। এরপর ইরাকের মতো আরববিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র বাংলাদেশের বাস্তবতাকে মেনে নিতে থাকে। ইয়েমেন, লেবানন, মরক্কো, মিশর, সিরিয়াসহ বিভিন্ন আরব রাষ্ট্র একে একে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

ইউরোপের নন-কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের স্বীকৃতি: ডেনমার্ক প্রথম

ওয়ারশ জোটভুক্ত তিনটি ইউরোপীয় কমিউনিস্ট দেশ–পূর্ব জার্মানি, বুলগেরিয়া ও পোল্যান্ড স্বীকৃতির পর ইউরোপের প্রথম নন-কমিউনিস্ট দেশের মধ্যে প্রথম স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ডেনমার্ক। ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি ডেনমার্ক সরকার বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বলে ডেনিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বোয়ার্জ এন্ডারসন ঘোষণা করেন। যদিও ডেনমার্কের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাওয়া যায় দুই সপ্তাহ পর ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে গণহত্যার নিন্দা করে নিউজিল্যান্ড জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে যে প্রস্তাব উত্থাপন করে, ডেনমার্ক এর অন্যতম উদ্যোক্তা ছিল।

লাতিন আমেরিকার স্বীকৃতি: প্রথম রাষ্ট্র কিউবা

লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কিউবা বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লিতে কিউবার চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স বাংলাদেশ মিশনপ্রধান হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে কিউবার স্বীকৃতির সিদ্ধান্তের কথা জানান। হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী কিউবার স্বীকৃতির তথ্য সংবাদমাধ্যমকে অবহিত করেন। তিনি জানান, কিউবার চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স বাংলাদেশের সঙ্গে পুরোপুরি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তাদের সরকারের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

কিউবা মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই বন্ধুরাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের পাশে ছিল। এ সময় কিউবা জাতিসংঘে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে ছিল তার অবস্থান। স্বাধীন দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশের দুই মাসের মধ্যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে কিউবা বাংলাদেশের সঙ্গে তার বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করেছিল নিঃসন্দেহে।

পারস্পরিক স্বীকৃতি: উত্তর ভিয়েতনাম ও গিনি-বিসাউ

দুটি ক্ষেত্রে পারস্পরিক স্বীকৃতির ঘটনা ঘটেছে, যা স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ঘটনা বলা যায়।

১৯৭২ সালের ২৫ নভেম্বর বাংলাদেশ উত্তর ভিয়েতনামকে স্বীকৃতি দেয়। বিপরীতদিকে একই দিনে উত্তর ভিয়েতনামও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

অন্যদিকে ১৯৭৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ নতুন আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র গিনি-বিসাউকে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশ গিনি-বিসাউকে স্বীকৃতি দেওয়ার ধারাবাহিকতায় তিনদিনের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ৪ অক্টোবর বাংলাদেশকেও গিনি-বিসাউ স্বীকৃতি দেয়।

স্বাধীনাতালাভের পর বাংলাদেশ সরকার বিশ্বের সর্বত্র জাতীয় মুক্তিসংগ্রামরত জনগণের প্রতি সমর্থনদানের কথা বিভিন্ন সময় ঘোষণা করেছে। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও বহুবার দেশে-বিদেশে এ কথা ঘোষণা করেছেন। কানাডার রাজধানী অটোয়ায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে এবং আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনেও সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মুক্তিকামী জনগণের প্রতি বাংলাদেশের অকুণ্ঠ সমর্থনদানের কথা ঘোষণা করা হয়। ধারণা করা যেতে পারে, উত্তর ভিয়েতনাম ও গিনি-বিসাউকে স্বীকৃতিদানের ঘটনা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ সরকারের উল্লিখিত নীতিরই প্রতিফলন।

উপসংহার

ঘটনার গুরুত্বের জন্য সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবর ও অন্যান্য তথ্য দীর্ঘদিন প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদপত্রের সংশ্লিষ্ট খবর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বও পেয়েছিল। বিশ্বের পাঁচ বৃহৎ শক্তি অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও চীনের স্বীকৃতি দেওয়ার খবর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বলাভ করেছিল। গুরুত্ব পেয়েছিল পাকিস্তানের স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট ইতিবাচক ও নেতিবাচক খবর উপস্থাপনায়। আর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভসংশ্লিষ্ট খবরও উপস্থাপিত হয়েছে গুরুত্বের সঙ্গে।

যেহেতু সমকালীন সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবর বিশেষ গুরুত্বলাভ করেছিল এবং দীর্ঘদিন ধরে সংবাদপত্রে বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে, তাই বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি দেওয়ার ঘটনাপ্রবাহ এবং স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে নানা টানাপোড়েনের বিষয়গুলো নিয়ে সংবাদপত্রগুলো সম্পাদকীয় প্রকাশ করে নিজেদের মতামত ও পরামর্শ তুলে ধরেছে। দিকনির্দেশনাও দিয়েছে। সার্বিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির প্রশ্নে সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকীয় নীতিতে কোনো অমিল ছিল না। এমনকি ১৯৭৫ সালের আগস্টে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরও এক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায়নি।

লেখক: গবেষণা বিশেষজ্ঞ (চলতি দায়িত্ব)
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু একসূত্রে গাঁথা

ড. হারুন রশীদ

আজ থেকে ৫১ বছর আগে একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার জন্য এ দেশের মানুষকে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করতে হয়েছে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী এদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। চালায় নির্মম গণহত্যা। তারা অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র নিয়ে পিলখানা, ইপিআর, রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, শিক্ষকদের বাসস্থানে হামলা চালায় এবং বিভিন্ন স্থানে আগুন জ্বালিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। বস্তি, টার্মিনালসহ জনবহুল এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘুমন্ত মানুষের ওপর। তাদের এই ভয়াবহ তাণ্ডব চলে সারা রাত। এই রাতেই বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। মূলত ২৬ মার্চ প্রত্যুষেই শুরু হয় বাংলার গণমানুষের সশস্ত্র প্রতিরোধ। বলা চলে, নিজস্ব রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি তথা চূড়ান্ত লড়াই এই দিনই শুরু হয়।

তারপর হানাদারদের বিরুদ্ধে গড়ে উঠে একের পর এক সর্বাত্মক প্রতিরোধ। এক কোটি মানুষ প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় নেয় শরণার্থী হিসাবে। গঠিত হয় বঙ্গবন্ধুকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি করে প্রবাসী সরকার, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সেক্টর, মুক্তিবাহিনী, গেরিলাবাহিনী, মুজিববাহিনীসহ বিভিন্ন মুক্তি ফৌজ। অবশেষে ৩০ লাখ মানুষের জীবন ও অসংখ্য মা-বোনের সম্ভ্রমহানির মধ্য দিয়ে আমরা চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে এনেছি একই বছরের ১৬ ডিসেম্বর। স্বাধীনতার জন্য এমন আত্মত্যাগ খুব কম জাতি করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সেদিন পুরো জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিতে পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। সেই সময় ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ মুক্ত স্বদেশে পালিত হয় স্বাধীনতার প্রথম বার্ষিকী। সেদিন ছিল দেশ গড়ার প্রেরণায় সবাই উজ্জীবিত। সদ্যস্বাধীন দেশটির উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি সেদিন

যুদ্ধাপরাধ-মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালে স্বাধীনতাবিরোধীদের হাতে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে শহিদ হন। এরপর পর্যায়ক্রমে খন্দকার মোশতাক ও সামরিক একনায়করা দেশে দুঃশাসন কায়েম করে। যারা ছিল মূলত স্বাধীনতাযুদ্ধে পরাজিতদেরই দোসর। এদের আমলেই দেশের পবিত্র সংবিধান ক্ষতবিক্ষত হয় এবং মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়।

স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলরা এখনো সক্রিয়। তারা বাংলাদেশে মূলত একটি 'পাকিস্তানি মডেলের' শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে চায়। তারা একসময় দেশ থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম-নিশানা মুছে দেওয়ার অপচেষ্টা চালায়। বেতার, টেলিভিশনসহ সব সরকারি প্রচারমাধ্যমে তারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম প্রচার নিষিদ্ধ করেছিল। তারপর রাজনীতির মারপ্যাঁচে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সরাসরি অংশীদারও হয়েছিল এই স্বাধীনতাবিরোধীরা।

এতে তারা সাময়িকভাবে লাভবান হলেও আখেরে সফল হয়নি, এদেশের মানুষ তাদের সফল হতে দেয়নি। এখন রাষ্ট্রক্ষমতায় মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ। এই দলটির নেতৃত্বে বাংলাদেশ আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে, যারা একদিন বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ির অপবাদ দিত, সেই কলঙ্কও এখন মুছে গেছে। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ হয়েছে। বাস্তবায়ন হচ্ছে মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু টানেলসহ বড়ো বড়ো উন্নয়ন প্রকল্প। মহাকাশে পৌঁছে গেছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট। বিদ্যুৎ এখন পারমাণবিক যুগে। মাতারবাড়ীতে বাস্তবায়ন হচ্ছে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প।

মাথাপিছু আয় বাড়ছে। কমছে ধনী-গরিব বৈষম্য, যদিও তা প্রত্যাশা অনুযায়ী নয়। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু কমেছে। বেড়েছে গড় আয়ু। সমরশক্তির দিক থেকেও এগিয়েছে বাংলাদেশ। নৌবাহিনীতে যুক্ত হয়েছে দুটি অত্যাধুনিক সাবমেরিন। সবদিক দিয়েই এখন শুধু সামনে এগিয়ে চলার স্বপ্ন, সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন।

স্বাধীনতার চার দশকেরও বেশি সময় পর একাত্তরের কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম আবার শুরু হয়ে তা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। জামায়াত নেতা কাদের মোল্লা, কামারুজ্জামান, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, মীর কাসেম আলী ও বিএনপি নেতা সাকা চৌধুরীর মতো চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসির দণ্ড ইতোমধ্যে কার্যকর হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে দায়মোচনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আসলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করা ছাড়া আমাদের জাতীয় জীবনের সব ক্ষেত্রকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আলোকিত করা সম্ভব নয়। তাই এই বিচার সম্পন্ন করে প্রজন্মের পর প্রজন্ম সেই চেতনার মশাল জ্বালিয়ে রাখার শপথ নিতে হবে।

আমরা এই বিজয় দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহকর্মী মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সব নেতাকে। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সব শহিদ, মুক্তিযোদ্ধা ও নির্যাতিত মা-বোনদের। যে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে এদেশের সাধারণ মানুষ অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল, জীবনপণ শপথ নিয়েছিল, তা বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব আমাদের সবার। আমরা এই দিবসে সেই দায়িত্বের কথা স্মরণ করছি। নতুন করে শপথ নিচ্ছি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, শোষণ-বঞ্চনাহীন উন্নত-সমৃদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়ার। দুর্নীতি রোধ, পরমতসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি, গণতন্ত্রচর্চা, নির্বাচনব্যবস্থা শক্তিশালী করা, জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসন, কার্যকর সংসদ–সর্বোপরি জনপ্রত্যাশা পূরণে সরকারকে মনোযোগী হতে হবে।

দুই.

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী বাঙালির জন্য অনন্য এক প্রাপ্তি। তিনি এমন এক নেতা, যিনি বাঙালিকে দিয়েছেন একটি দেশ, পতাকা ও মানচিত্র। একটি সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। তাই তো তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। কবির ভাষায়: 'পুরুষোত্তম তুমি, জাতির পিতা'। যতই দিন যাচ্ছে, বাঙালির কাছে বঙ্গবন্ধুর অপরিহার্যতা আরও বাড়ছে। জন্মশতবর্ষ পেরিয়ে আরও উজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু। বস্তুত বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম এবং অপরিসীম ত্যাগের অর্জন স্বাধীনতা ছিল অকল্পনীয়। তাই বঙ্গবন্ধু এবং স্বাধীনতা একসূত্রে গাঁথা। ইতিহাসের দেওয়াললিখনে লেখা থাকবে: 'স্বাধীনতার অপর নাম শেখ মুজিবুর রহমান।'

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন স্বাধীনতার স্থপতি। তাঁর অসাধারণ নেতৃত্বের গুণে তিনি কেবল বাংলার অবিসংবাদিত নেতা হিসাবেই পরিগণিত হননি, নিজেকে নেতৃত্বের এমন এক সুমহান স্তরে সমাসীন করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে একাত্তরে অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর নাম বলতে বলতেই দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছেন।

একাত্তরের ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে কারাবন্দি করে। কিন্তু কী আশ্চর্য! বন্দি মুজিব আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। রণাঙ্গনে প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধাই হয়ে উঠলেন একেকজন মুজিব। তাঁর নামেই পরিচালিত হলো মুক্তিযুদ্ধ। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অবশেষে বাঙালি পেল দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা। যে স্বাধীনতার জন্য বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে ধীরে ধীরে তৈরি করেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধু সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পর পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে তাঁকে গ্রেফতার করে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে আটক রাখা হয়। কিন্তু তাঁর নামেই পরিচালিত হয় মুক্তিযুদ্ধ।

অবশেষে বাঙালি পায় তার বহুদিনের লালিত স্বপ্নের লাল-সবুজ পতাকা আর স্বাধীন মানচিত্র। অবশেষে পাকিস্তানি জান্তা স্বাধীন দেশের নেতাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পাকিস্তানের অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করেন। এর মধ্য দিয়ে জাতি বিজয়ের পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করে।

১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয়ের পর বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জানানোর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিল। আনন্দে আত্মহারা লাখ লাখ মানুষ ঢাকা বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দান পর্যন্ত তাঁকে স্বতঃস্ফূর্ত সংবর্ধনা জানান। বিকাল ৫টায় রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ১০ লাখ লোকের উপস্থিতিতে তিনি ভাষণ দেন। এদিন সশ্রদ্ধচিত্তে তিনি সবার ত্যাগের কথা স্মরণ করেন, সবাইকে দেশ গড়ার কাজে উদ্বুদ্ধ করেন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর আগমন বাঙালি জাতির জন্য একটি বড়ো প্রেরণা হিসাবে কাজ করে। দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষা, আন্দোলন ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়

অর্জনের পর বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার প্রশ্নে বাঙালি যখন কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি, তখন পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। ২৯০ দিন পাকিস্তানের কারাগারে মৃত্যুযন্ত্রণা শেষে লন্ডন থেকে দিল্লি হয়ে মুক্ত স্বাধীন স্বদেশের মাটিতে ফেরেন বঙ্গবন্ধু।

তেজগাঁও বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী বিমানটি অবতরণ করার পর খোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে জনসমুদ্রের ভেতর দিয়ে রেসকোর্স ময়দানে এসে পৌঁছাতে আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে। সেদিনকার রেসকোর্স ময়দান ছিল লোকে লোকারণ্য। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ১৭ মিনিট জাতির উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন, যা ছিল জাতির জন্য দিকনির্দেশনা।

বাংলাদেশের আদর্শগত ভিত্তি কী হবে, রাষ্ট্র কাঠামো কী ধরনের হবে, যারা পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে দালালি ও সহযোগিতা করেছে, তাদের কী হবে; বাংলাদেশকে বহির্বিশ্ব স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ; মুক্তিবাহিনী, ছাত্রসমাজ, কৃষক, শ্রমিকদের কাজ কী হবে–এসব বিষয়সহ বিভিন্ন দিকনির্দেশনা ছিল ভাষণে। তিনি প্রথমেই দেশ গড়ার ডাক দিলেন। রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত মন্ত্রমুগ্ধ জনতা দুহাত তুলে সেই সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সেদিন তিনি বলেন, 'আমার আদেশ, আজ থেকে আমার হুকুম ভাই হিসেবে, নেতা হিসেবে নয়, প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়–আমি তোমাদের ভাই, তোমরা আমার ভাই। এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না পায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না, যদি আমার বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এই স্বাধীনতা পূর্ণ হবে না, যদি এ দেশের মা-বোনেরা ইজ্জত ও কাপড় না পায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণতা হবে না, যদি এ দেশের মানুষ–যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে, তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।'

১৯৬৭ সালের ১৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারের রোজনামচায় লিখেছিলেন, 'আজ আমার ৪৭তম জন্মবার্ষিকী। এই দিনে ১৯২০ সালে পূর্ববাংলার এক ছোট্ট পল্লীতে জন্মগ্রহণ করি। আমার জন্মবার্ষিকী আমি কোনোদিন নিজে পালন করি নাই–বেশি হলে আমার স্ত্রী এই দিনটাতে আমাকে ছোট্ট একটা উপহার দিয়ে থাকত। এই দিনটিতে আমি চেষ্টা করতাম বাড়িতে থাকতে। খবরের কাগজে দেখলাম, ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগ আমার জন্মবার্ষিকী পালন করছে। বোধহয়, আমি জেলে বন্দি আছি বলেই। আমি একজন মানুষ, আর আমার আবার জন্মদিবস! দেখে হাসলাম।' এই হলেন বাংলার অবিসংবাদিত নেতার অকৃত্রিমতা।

শোষক ও স্বেচ্ছাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে বঙ্গবন্ধুর ছিল ঐতিহাসিক ভূমিকা। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির শৃঙ্খল থেকে বাঙালিকে মুক্ত করে তিনি স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সেই স্বপ্ন তিনি বাস্তবায়ন করেছেন। এ মুক্তির সংগ্রামে তিনি নিজের জীবনকে তুচ্ছ করেছিলেন। কিশোর বয়স থেকেই প্রতিবাদী ছিলেন। সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের কথা বলেছেন। সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে তিনি কখনোই দূরে সরে যাননি। ভীতি ও অত্যাচারের মুখেও সব সময় সত্য ও ন্যায়ের পথে থেকে শোষিত মানুষের অধিকারের কথা বলেছেন। আর এভাবেই তিনি হয়ে উঠেন স্বাধীনতার মূর্তপ্রতীক। শোষিত মানুষের পক্ষে নির্ভীক অবস্থানের কারণে তিনি কেবল বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বে অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে স্বীকৃতি পান।

১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ, যেখানে তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন, 'বিশ্ব আজ দুইভাগে বিভক্ত, একপক্ষে শোষক, আরেকপক্ষে শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।' জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে শোষিত মানুষের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর এই অবস্থান বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়। বিশ্বের শোষিত-নির্যাতিত মানুষ বঙ্গবন্ধুকে গ্রহণ করে নেয় নিজেদের নেতা হিসাবে।

বঙ্গবন্ধুকে বর্ণনা করতে গেলে কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর উক্তি সবার আগে মনে পড়বে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব, তাঁর সিদ্ধান্ত, অবিচলতা নিয়ে বলতে গিয়ে ফিদেল কাস্ত্রো বলেন, 'আমি হিমালয় দেখিনি; কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় তিনি হিমালয়ের মতো।'

২০২০ সালের ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মগ্রহণের শততম বছর পূর্ণ হয়েছে। এটি অনন্য গৌরবের বিষয় যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথভাবে উদ্‌যাপন করে জাতিসংঘের বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক সংস্থা (ইউনেস্কো)।

মহান এই নেতার জন্মশতবার্ষিকী বাঙালি জাতিকে দেয় নতুন এক দিশা। দেশাত্মবোধে নতুন করে উদ্বুদ্ধ হয়ে পথ চলতে হবে। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনটি 'জাতীয় শিশু দিবস' হিসাবে পালিত হচ্ছে। ১৯৯৭ সালের ১৭ মার্চ প্রথমবারের মতো এই দিনটি শিশু দিবস হিসাবে সরকারিভাবে পালন করা হয়। ২০০১ সালে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই দিনটি রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত হয়নি। তবে দলীয় ও বেসরকারিভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছে।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতাসীন হলে এই দিনটিও আগের মতো যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। জাতির পিতার জন্মদিনটিকে শিশুদিবস হিসাবে পালন করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল আজকের শিশুই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আগামী দিনে দেশ গড়ার নেতৃত্ব তাদের হাতেই। শিশুরা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, মর্যাদা ও মহিমায় সমৃদ্ধ হোক–এটাই ছিল তাঁর একান্ত চাওয়া।

বর্তমানে দেশের ১৬ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ৬ কোটিই শিশু। শিশু যাতে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক উপায়ে বেড়ে উঠতে পারে, সেটি নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাদের আগামী দিনের সুযোগ্য নাগরিক হিসাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দিতে হবে। তবেই বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন শিশুদিবস হিসাবে পালনের সার্থকতা।

বঙ্গবন্ধুর জীবন শিশুদের জন্য তো বটেই, সবার জন্যই এক শিক্ষণীয় বিষয়। তাঁর অপরিসীম ত্যাগ ও তিতিক্ষার জন্য আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি। স্বাধীন জাতি হিসাবে বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছি। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি যেমন আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, তেমনই দেশের জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। এজন্য বাঙালি জাতি চিরকাল তাঁকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। তাই তো কবি অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন:

'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।
দিকে দিকে আজ অশ্রুমালা
রক্তগঙ্গা বহমান
তবু নাই ভয় হবে হবে জয়,
জয় মুজিবুর রহমান।'

লেখক: সাংবাদিক, কলামিস্ট; ডেপুটি এডিটর, জাগো নিউজ

বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিভূমি

ফারহানা মিলি

কোনো রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি নির্ভর করে দেশটির নেতৃত্বের রাজনৈতিক দর্শন ও প্রজ্ঞার ওপর। এ দুইয়ের মহাসংযোগেই রচিত হয় রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সাফল্যের ভিত্তি। বক্তব্যটির তাৎপর্য বুঝতে একটু পেছনে ফেরা যাক। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ভূখণ্ডের ১৩টি ব্রিটিশ উপনিবেশের স্বাধীনতাকামী জনতা ঔপনিবেশিক প্রশাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। যুদ্ধজয়ের পর তৈরি হয় পৃথিবীর ইতিহাসের অনন্য এক দলিল–যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। রচিত হয় অভূতপূর্ব এক সংবিধান–যেটিতে গণতন্ত্র, অধিকার, স্বাধীনতা, সুযোগ ও সমতার অঙ্গীকারের মাধ্যমে নতুন সমাজ গড়ে তোলার কথা বলা হয়। এই সংবিধানেই পোঁতা ছিল 'আমেরিকান ড্রিম'-এর শেকড়।

যুক্তরাষ্ট্রের ওই রাষ্ট্রনৈতিক রূপান্তরের পেছনে উন্মুখ জনতার যেমন ভূমিকা ছিল, তেমনই 'প্রতিষ্ঠাতা পিতা' (ফাউন্ডিং ফাদার) নামে খ্যাত সাত মহারথীরও ছিল মহতী অবদান। তাদের একজন, মার্কিন স্বাধীনতার দলিলের প্রধান লেখক টমাস জেফারসন। উনিশ শতকের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট হিসাবে দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। এর আগে প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের অধীনে জেফারসনই ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। অর্থাৎ তিনিই যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী। পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তার এক অনন্য উক্তি ছিল এরকম–'শান্তি, বাণিজ্য ও প্রত্যেক জাতির সঙ্গে সৎ বন্ধুত্ব।'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র এই নীতি থেকে সরে এলেও বিশ শতকের সত্তরের দশকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এশিয়ার দক্ষিণ গোলার্ধের এক রাষ্ট্রের জননেতা মার্কিন স্বাধীনতার সেই মহানায়কদের মতো করেই বললেন, 'নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি হবে–সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে শত্রুতা নয়।'

বঙ্গবন্ধু এই বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন ছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে এক বেতার ভাষণে তিনি সত্যিকারের স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করার কথা দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করেন। তাঁর এ ভাষণের পথরেখা ধরেই ১৯৭১ সালের প্রবাসী মুজিবনগর সরকার নবীন দেশের পররাষ্ট্রনীতির চিত্রটি এঁকে নেয়

তিনি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা। তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি আস্থাশীল ছিলেন মানবিক সমাজের দর্শনে। তাই নতুন জাতিরাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপটে তিনি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিলেন আপন দর্শন।

ঊষালগ্নেই সুচিন্তিত পদক্ষেপ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বিশ্ব আদর্শিক ভিত্তিতে দুটি মেরুতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো, জাপানসহ পুঁজিবাদী বলয় এবং তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন পূর্ব ইউরোপীয় ও মিত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো। দুটি বলয়ে চলছিল দুনিয়া কাঁপানো 'ঠান্ডা লড়াই'। এরই মাঝে এশিয়া-আফ্রিকা-ইউরোপের উদীয়মান কয়েকটি রাষ্ট্রের চৌকশ নেতারা নিরপেক্ষ একটি অবস্থান থেকে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের ফল্গুধারা বজায় রেখেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু এই বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন ছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে এক বেতার ভাষণে তিনি সত্যিকারের স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করার কথা দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করেন। তাঁর এ ভাষণের পথরেখা ধরেই ১৯৭১ সালের প্রবাসী মুজিবনগর সরকার নবীন দেশের পররাষ্ট্রনীতির চিত্রটি এঁকে নেয়।

১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি। সদ্যস্বাধীন দেশের মহানায়ক সেদিন পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডনে পা রেখে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন। আলোচনায় ব্রিটেনের তরফ থেকে বাংলাদেশের স্বীকৃতি ও বাংলাদেশের কমনওয়েলথভুক্তির বিষয়গুলো তুলে ধরলেন তিনি। নেতার পরের গন্তব্য ছিল নয়াদিল্লি। সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়টি তুলে ধরেন। সদ্যস্বাধীন একটি দেশের নেতা হিসাবে ভারতের মতো আঞ্চলিক শক্তির সঙ্গে সমতাভিত্তিক বন্ধুত্বের বার্তা পৌঁছে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য নেতৃত্বের প্রমাণ।

পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিভূমি

আঠারো শতকের মার্কিন মহানায়করা যেভাবে 'আমেরিকান ড্রিম'-এর স্বপ্ন সুতোয় গেঁথে তোলেন, বঙ্গবন্ধু তেমনই নিয়ে আসেন 'সোনার বাংলা'-এর স্বপ্ন। ১০ জানুয়ারি দুপুরে দেশের মাটিতে পা রেখেই নতুন করে বললেন সে কথা। পরের দিন ১১ জানুয়ারি অস্থায়ী সাংবিধানিক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে দীর্ঘ প্রতিশ্রুত সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থার প্রবর্তন ঘোষিত হলো। নতুন রাষ্ট্রের প্রথম সংসদ গঠিত হলো ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ীদের নিয়ে। ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রণীত হয় প্রায়োগিক দিক থেকে অত্যন্ত জুতসই ও ভারসাম্যপূর্ণ এক পররাষ্ট্রনীতি–'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়।' যার সারার্থ হলো, বিশ্বে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান। বাহাত্তরে তৈরি সংবিধানেও বলা হয়, 'বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তির ব্যবহার থেকে নিরস্ত্র থাকবে এবং পরিপূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য সচেষ্ট হবে।'

পরীক্ষিত বন্ধুদের পাশে রেখে

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির শেকড়ে যে উদাত্ত বন্ধুত্বের আবাহন, সেখানে প্রথমেই ছিল বিপদে পাশে থাকা বন্ধুদের স্বীকৃতি। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে সে কাজটি করেছেন বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। ধন্যবাদ জানালেন পূর্ব ইউরোপসহ ফ্রান্স, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের জনগণসহ গণমাধ্যমের প্রতি।

১৯৭২ সালের ২–৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের বৃহত্তম মিত্র দেশ তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন। ক্রেমলিনে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল লিওনিদ ব্রেজনেভ ও প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নির সঙ্গে আলোচনা করেন। ৩ মার্চ সই হয় বাংলাদেশ-সোভিয়েত অর্থনৈতিক চুক্তি। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন ও বঙ্গবন্ধুর আলোচনার পর এলো 'মুজিব-কোসিগিন' ঘোষণা।

উন্নত দেশগুলোর মিত্রতা

১৯৭৩ সালের ১৯ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাপান সফরকালে প্রধানমন্ত্রী কাকুই তানাকার সঙ্গে বৈঠকে যমুনা সেতু নির্মাণ এবং এক্ষেত্রে জাপানের সহযোগিতার আশা প্রকাশ করেন।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে বঙ্গবন্ধু ১ অক্টোবর ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিগতভাবে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহী ছিলেন। ১৯৭৪ সালে বন্যার্তদের জন্য এক মিলিয়ন ডলার সাহায্যসহ চীনের রেড ক্রসের টিম বাংলাদেশে আসে। বাংলাদেশের প্রতি চীনের মনোভাবের এই ধীর পরিবর্তনের ভিত্তিভূমিও বঙ্গবন্ধু সরকারের তৈরি।

আরববিশ্বের বন্ধুত্ব

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন বঙ্গবন্ধু সরকারের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম সাফল্য। ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসাসেবা দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু মিশর ও সিরিয়ায় এক লাখ পাউন্ড চা ও চিকিৎসকদল পাঠান। একই বছরের সেপ্টেম্বরে আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে আয়োজিত জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু আরববিশ্বের দেশগুলোর সামনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরেন। এরই পথ ধরে ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে যোগ দেন বঙ্গবন্ধু। মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের ফলেই বাংলাদেশ ওই দেশগুলোয় জনশক্তি রপ্তানির সুযোগ পায়। আজ প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। সেই ভিত্তিটি বঙ্গবন্ধু তৈরি করেছিলেন তাঁর দূরদর্শিতার গুণে।

বিশ্ব সংস্থাগুলোর অর্গল যেভাবে খোলে

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে বাংলাদেশ যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে তার মধ্যে অন্যতম কমনওয়েলথ অব নেশন্স, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, ইসলামি সম্মেলন সংস্থা ও জাতিসংঘ। এ চারটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিটি সম্মেলন ও অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু ছিলেন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক সাফল্যে ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের বেশ কয়েকটি অঙ্গ সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। যেমন: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (১৯ মে ১৯৭২), আইএমএফ (১৭ আগস্ট ১৯৭২), আঙ্কটাড (২০ মে ১৯৭২), আইএলও (২২ জুন ১৯৭২), ইউনেস্কো (২৭ অক্টোবর ১৯৭২), গ্যাট (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২), এসক্যাপ (১৭ এপ্রিল ১৯৭৩), ফাও (১২ নভেম্বর ১৯৭৩) প্রভৃতি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে গঠিত এসব সংস্থার সদস্যপদ বাংলাদেশকে বাণিজ্য ও অর্থ সহায়তার ক্ষেত্রে বিপুলভাবে উপকৃত করেছে।

১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশকে ১৩৬তম সদস্য হিসাবে গ্রহণ করে।

কূটনৈতিক সাফল্যের স্বীকৃতি

১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউজউইক পত্রিকা শেখ মুজিবুর রহমানকে 'আ পোয়েট অব পলিটিক্স' আখ্যায়িত করে লেখে, 'তিনি লাখ লাখ মানুষকে আকর্ষণ করতে পারেন, সমাবেশে এবং আবেগময় বাগ্মিতায় তরঙ্গের পর তরঙ্গে তাদের সম্মোহিত করে রাখতে পারেন। তিনি রাজনীতির কবি।'

১৯৭৩ সালের ৫ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন-ন্যামের চতুর্থ শীর্ষ সম্মেলনে কিউবার নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎ হয়। কাস্ত্রো বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলেন, 'আই হ্যাভ নট সিন দ্য হিমালয়াস। বাট আই হ্যাভ সিন শেখ মুজিব। ইন পারসোনালিটি অ্যান্ড ইন কারেজ, দিস ম্যান ইস দ্য হিমালয়াস।'

১৯৭৩ সালের ২২ ও ২৩ মে ঢাকায় বিশ্ব শান্তি পরিষদ আয়োজিত দুইদিনব্যাপী সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুকে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ম্যারি কুরি ও পিয়েরে কুরির সম্মানে উদ্ভাবিত 'জুলিও কুরি' শান্তিপদক দেওয়া হয়। এটি ছিল বাংলাদেশের পক্ষে প্রাপ্ত প্রথম আন্তর্জাতিক পদক।

নীতির সাফল্য সুদূরপ্রসারী

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সামগ্রিক মূল্যায়নে যে সত্যটি প্রতিভাত হয় তা হলো, পররাষ্ট্রনীতির মৌল কাঠামো ও ভিত্তি বঙ্গবন্ধুর সময় রচিত হয়। ১৯৭২ সালের ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার শক্তি কীসে?'

বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আমি আমার জনগণকে ভালোবাসি।'

'আর আপনার দুর্বল দিকটা কী?'

বঙ্গবন্ধুর উত্তর, 'আমি আমার জনগণকে খুব বেশি ভালোবাসি।'

ক্ষণজন্মা এই মানুষটি দেশের প্রতি অতল ভালোবাসা থেকে এমন এক পররাষ্ট্রনীতির ভিত রচনা করেন, যা অর্ধশতাব্দী পেরিয়েও প্রাসঙ্গিক। রাষ্ট্র হিসাবে আজ আমরা পৃথিবীর বুকে সমাদৃত। ৫১ বছর আগে এই স্বীকৃতিটুকু আদায় করতে জাতির মহানায়ককে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতায় বিশ্বকে জয় করতে হয়েছিল, সে কথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

লেখক: সাংবাদিক

একই বছরের সেপ্টেম্বরে আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে আয়োজিত জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু আরববিশ্বের দেশগুলোর সামনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরেন। এরই পথ ধরে ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে যোগ দেন বঙ্গবন্ধু

ইতিহাসের কাছে নিয়ে যেতে হবে নতুন প্রজন্মকে

রাজন ভট্টাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) এক সমীক্ষায় দেখা যায়, দেশের গ্রামাঞ্চলে ১১ থেকে ১৭ বছর বয়সি প্রায় ৩৩ শতাংশ শিশু ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। ইন্টারনেট ব্যবহার করা মোট শিশুর প্রায় ৫৯ শতাংশ অনলাইনে অন্তত একধরনের নিপীড়নের শিকার হয়েছে। গবেষণার ফলাফল অনুসারে, ৩৮ শতাংশ শিশু অন্তত দুই ধরনের সাইবার নিপীড়নের শিকার এবং ২৬ শতাংশ শিশু অন্তত তিন ধরনের নিপীড়নের শিকার হয়েছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০ কোটি ৬৪ লাখের বেশি। এর মধ্যে ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৮৬ লাখ। বাকিরা মুঠোফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন।

গত এক দশকে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে ব্যাপকভাবে। ডিজিটাল হয়েছে বাংলাদেশ। সময়ের প্রয়োজনেই তা হয়েছে। কারণ, গোটা পৃথিবী এখন তথ্যপ্রযুক্তিতে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা বসে থাকতে পারি না। কিন্তু মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট আসক্তি প্রজন্মের একটি বড়ো অংশকে বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এতে তরুণ প্রজন্মের স্বাভাবিক জীবনযাপনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

প্রশ্ন হলো, এক দশকে শিশুদের মধ্যে যেভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার ও মোবাইল ফোন এমনকি ডিভাইস আসক্তি বেড়েছে, স্বাধীনতার ৫১ বছর পর দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের দিকে তাদের সেভাবে আমরা মনোনিবেশ করাতে পেরেছি কি। এককথায় এ প্রশ্নের জবাব হলো, 'না'। যে কোনো কারণেই হোক তা সম্ভব হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ এই কাজটি করতে সবাই মিলে ব্যর্থ হয়েছি, যা একটি দেশের জন্য মোটেই সুখকর সংবাদ নয়।

একটি দেশের জন্মের ইতিহাস সব নাগরিকের জানা প্রয়োজন। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে নিজ দেশের জন্মের ইতিহাস জানার বিকল্প নেই। এর মধ্য দিয়ে তাদের মনে দেশপ্রেম তৈরি হয়।

মনে রাখা দরকার, যে দেশ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে যত সমৃদ্ধ, সে দেশের সমাজ তত আলোকিত। সেখানে শান্তি আছে। সাম্প্রদায়িকতা নেই। শিশুকে নিয়ে দুর্ভাবনা নেই। আমরা সেই সুযোগ বা অধিকারটুকু শিশুর নিশ্চিত করতে পারছি না। সাংস্কৃতিক সংগঠন বা শিশু সংগঠনগুলো এখন নিষ্প্রাণ

মাতৃভূমির প্রতি আলাদা দরদ সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তেমনই দেশের জন্মের জন্য যাঁরা নিবেদিত হয়ে কাজ করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি তৈরি হয় অহর্নিশ শ্রদ্ধা; যা ভবিষ্যৎ জীবনে শিশুদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে বা সুনাগরিক হিসাবে বড়ো হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক শিশু। এর একটা বড়ো অংশই শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত। একটা সময় ছিল দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত গাওয়া হতো। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বা শহিদ দিবস পালন করা হতো। অপ্রিয় হলেও সত্যি যে, এখন অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীতটুকু পর্যন্ত গাওয়া হয় না। এমন কি শপথবাক্যও পাঠ করানো হয় না। কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা সরকারের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে না থাকায় শিশুদের একটি বড়ো অংশ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থেকে প্রায় অন্ধকারে। তেমনই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর শিক্ষাব্যবস্থা সাধারণ শিক্ষা থেকে একেবারেই আলাদা। যেখানে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয় দিবস নিয়ে খুব একটা ভাবনা নেই। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিজস্ব কারিকুলামে নিজেদের মতো করে চলার চেষ্টা করে। সেখানে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডও কার্যত নেই।

মানছি সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যুক্ত করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থেকেও প্রশ্নপত্র হচ্ছে। এর চেয়ে বড়ো বাস্তবতা হলো, পাঠ্যপুস্তকনির্ভরতায় সব জ্ঞান অর্জন বা সব ধরনের অন্ধকার দূর করা যায় না। তাছাড়া ২০০৮ সাল থেকে টানা তিন মেয়াদে ক্ষমতায় মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ। সবার প্রত্যাশা ছিল দীর্ঘ সময়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি অসাম্প্রদায়িক ও বিজ্ঞানমনস্ক আগামী প্রজন্ম গড়ে তোলা সম্ভব হবে। তা কি হয়েছে? তেমনই সাধারণ শিক্ষায় পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যুক্ত করার পর আমরা শিশুদের নিয়ে রাতদিন দুশ্চিন্তায় ভুগছি। এ থেকেই স্পষ্ট হয়েছে–পরিকল্পনার কোথাও না কোথাও গলদ আছে।

আগামী দিনের বাংলাদেশের সামনে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো দেশপ্রেমিক ও মেধাবী প্রজন্ম গড়ে তোলা। তাছাড়া সামাজিক নানা বাস্তবতায় তরুণ প্রজন্মের একটি অংশ নানা কারণে বিপথগামী। নেশা, কথিত রাজনৈতিক আসক্তি, অর্থ উপার্জনের লোভ, ডিভাইস আসক্তিসহ নানা কারণে এখন শিশুর বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিপদ পায়ে পায়ে।

বিপথগামী তরুণদের পাল্লায় পড়ে গ্যাংগিং কালচারে মনের অজান্তে শিশু নিজেদের জড়িয়ে ফেলছে। জুয়া খেলছে। বড়োদের সম্মান করছে না। প্রকাশ্যে ধূমপানসহ অন্যান্য নেশা করে বেড়াচ্ছে। পরিবারের লোকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে। চাপ সৃষ্টি করে অর্থ আদায় করছে। এমনকি হত্যা, রাহাজানি, চুরি ছিনতাইসহ সামাজিক নানা অপরাধে শিশু নিজেদের জড়িয়ে ফেলছে। এটা মোটেই সমাজের সুস্থধারার লক্ষণ নয়।

তেমনই সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প শিশুর মনে শেকড়ের মতো প্রতিস্থাপন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত একটি অংশ। কিন্তু দেশের শিশু সুস্থধারার সাংস্কৃতিক চর্চা, মেধাসহ শারীরিক বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে না। খেলার মাঠের সুবিধা থেকেও বঞ্চিত অনেক শিশু। স্কুলগুলোয় এখন আর আগের মতো খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের চর্চা নেই। কটা স্কুলে এখন নাটক হয়? কবিতা আবৃত্তি হয়, নাচ আর গানের আয়োজন হয়?

মনে রাখা দরকার, যে দেশ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে যত সমৃদ্ধ, সে দেশের সমাজ তত আলোকিত। সেখানে শান্তি আছে। সাম্প্রদায়িকতা নেই। শিশুকে নিয়ে দুর্ভাবনা নেই। আমরা সেই সুযোগ বা অধিকারটুকু শিশুর নিশ্চিত করতে পারছি না। সাংস্কৃতিক সংগঠন বা শিশু সংগঠনগুলো এখন নিষ্প্রাণ।

শিশুর বিপথে যাওয়ার পেছনে অভিভাবকদের উদাসিনতা, পারিবারিক বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাব এবং সামাজিক শিক্ষার অভাবসহ রাজনীতি অনেকাংশে দায়ী। এ নিয়ে ইতোমধ্যে অভিভাবকদের দুর্ভাবনার শেষ নেই। ছেলে বা মেয়ে হোক, এখন সব অভিভাবক সন্তানকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা নিয়ে সত্যিই মহা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। অথচ আমরা কিছুই করতে পারছি না। এজন্য সত্যি সত্যিই একটি সামাজিক জাগরণ প্রয়োজন।

আমাদের একক পরিবারগুলো ভেঙে টুকরা টুকরা হচ্ছে। সবাই সুখে থাকার প্রয়োজনে নিজের মতো করে চলার চেষ্টা করছে। গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে অসম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছেন অভিভাবকরা। সন্তানদের দিকে একেবারেই নজর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। নিজেদের মধ্যে অর্থসম্পদের ইস্যুতে নানা অঘটনসহ দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার ঘটনা শিশুদের মনোগজতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। সব মিলিয়ে শিশুকে সুস্থধারায় বড়ো করে তোলার পরিবেশ একেবারেই নেই। মা-বাবা

রাতদিন পাহাড়া দিয়ে স্কুলে আনা-নেওয়ার মধ্যেও সন্তান বিপথগামী হচ্ছে।

২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক শক্তি, সন্ত্রাস, উগ্রবাদের বিরুদ্ধে একটি বড়ো রকমের জাগরণ সৃষ্টির চেষ্টা চালানো হয়। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিকাশ ঘটানো। সেই নির্বাচনের পর আরও দুটি নির্বাচন গেল। কিন্তু নির্বাচন শেষে চেতনার বিকাশ তৃণমূলে ছড়িয়ে দিতে তেমন কোনো কাজ হয়নি। বড়ো পরিসরে যদি বলি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশের কথাটি শুধু সংবাদপত্রের পাতায়ই সীমাবদ্ধ। বস্তুত এজন্য তেমন কোনো কাজ বা উদ্যোগ নেই। যার বিরূপ প্রভাব কিন্তু সমাজে পড়তে শুরু করেছে। দিনদিন সামাজিক সংকট বাড়ছে। শিশুকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ বাড়ছে। অপরদিকে শিশুর মনে সাম্প্রদায়িকতার বীজ স্থাপন থেকে শুরু করে তাদের বিপথগামী করে তোলার জন্য একটি পক্ষ বিনিয়োগ করছে। এমনকি শিশুর মগজ ধোলাই করে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

কথা হলো, তাহলে কি সমস্যার কোনো সমাধান নেই? আমাদের প্রজন্মকে দেশপ্রেমের চেতনায় বড়ো করা সম্ভব হবে না? এজন্য রাষ্ট্র থেকে শুরু করে পরিবার ও সমাজকে একযোগে ভূমিকা রাখতে হবে। আমরা এমন প্রজন্ম চাই না, যে প্রজন্ম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানে না। বিজয় দিবস-স্বাধীনতা দিবস কবে–এমন প্রশ্নে মুখের দিকে অসহায়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বিশ্বের মধ্যে মায়ের ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ করা জাতি বাংলাদেশের বাইরে বিরল। রাজপথে বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে মায়ের ভাষা আমরা ছিনিয়ে এনেছি। সেই ভাষায় লিখছি। কথা বলছি। বলছি বাংলা প্রাণের ভাষা। অথচ আমাদের প্রজন্ম যদি ২১ ফেব্রুয়ারি কী–এ প্রশ্নের জবাব দিতে না পারে, তাহলে এই ব্যর্থতার দায় কারও এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং এদেশীয় দোসরদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন ৩০ লাখ মানুষ। সম্ভ্রম হারিয়েছেন তিন লাখ নারী। স্বাধীনতা অর্জনে কত মানুষ কষ্ট, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করতে করতে বুকের তাজা রক্ত বিলিয়ে দিতে হয়েছে, তা বলে শেষ করা যাবে না। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে 'বাংলাদেশ' নামের রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এই ইতিহাস অমর, অক্ষয়। বাংলাদেশ তথা পৃথিবী যতদিন থাকবে, ততদিন এই ইতিহাস চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। এখানেই শেষ নয়, দেশের প্রতিটি গ্রাম থেকে শহরের আনাচে-কানাচে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের জানা-অজানা ইতিহাস; যা আমাদের নতুন প্রজন্ম বলে কথা নয়, সব বয়সের মানুষের একটা বড়ো অংশ এসব ইতিহাস জানা থেকে বঞ্চিত।

আমরা স্বাধীনতা অর্জনের ৫১ বছর কাটিয়েছি। বিজয়ের ৫২ বছরে পা রাখার মুহূর্তে আজ আলোচনা করতে হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বড়ো করে তোলার প্রসঙ্গ নিয়ে। অথচ এ বিষয়টি এতদিন একটি কাঠামোর মধ্যে থাকার কথা ছিল। অর্থাৎ শিশু পরিবার, সমাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সব পর্যায়ে এ ইতিহাস জানতে পারবে। তাদের কোনো অন্ধকার সময় বা জগৎ স্পর্শ করতে পারবে না। যদি তা করা সম্ভব হতো, তাহলে আজ আগামী প্রজন্ম নিয়ে এত দুর্ভাবনা করতে হতো না।

এখনো সময় আছে শিশুকে দেশপ্রেমের চেতনায় বড়ো করে তোলার। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তাদের জানানো। এজন্য পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের কলেবর বাড়াতে হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের এনে যুদ্ধের গল্প শোনাতে হবে শিশুকে। তেমনই জাতীয় সব দিবস শিশুকে নিয়ে পালন করতে হবে। শিশু আবারও খালি পায়ে প্রভাতফেরিতে যাবে। দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত বাধ্যতামূলক করার কোনো বিকল্প নেই। শিশুর জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক পরিবেশ নিরাপদ করতে হবে।

রাজপথে বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে মায়ের ভাষা আমরা ছিনিয়ে এনেছি। সেই ভাষায় লিখছি। কথা বলছি। বলছি বাংলা প্রাণের ভাষা। অথচ আমাদের প্রজন্ম যদি ২১ ফেব্রুয়ারি কী–এ প্রশ্নের জবাব দিতে না পারে, তাহলে এই ব্যর্থতার দায় কারও এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই

শিশুকে স্মৃতিসৌধ, বধ্যভূমিসহ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত সব স্থাপনার সঙ্গে পরিচয় করানো প্রয়োজন। যে শিশু মুক্তিসংগ্রামের সঠিক ইতিহাস জানবে এবং জাতীয় সংগীত হৃদয়ে ধারণ করে বড়ো হবে, সেই শিশুটি কখনো বিপথগামী হতে পারে না। তাকে সাংস্কৃতিক চর্চার সঙ্গেও যুক্ত করতে হবে। বেড়ে ওঠার উপযুক্ত পরিবেশ শিশুর জন্য নিশ্চিত করা গেলে সে অন্ধকারে পা বাড়াবে না। এজন্য অভিভাবক, শিক্ষক থেকে শুরু করে সর্বোপরি সমাজকে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে। এর মধ্য দিয়ে আমরা আগামী দিনে পেতে পারি একটি দেশপ্রেমিক প্রজন্ম, যা বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা রাখতে পারে। এজন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা খুবই জরুরি।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের বিজয় দিবস

নিরঞ্জন রায়

ডিসেম্বর এলেই বাঙালি জাতির জীবনে এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কেননা ১৯৭১ সালের এই ডিসেম্বরেই বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ ৯ মাস সংগ্রাম করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে ছিনিয়ে এনেছিল আমাদের স্বাধীনতা। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করলে বাঙালি জাতির বিজয় অর্জিত হয় এবং পৃথিবীর মানচিত্রে সৃষ্টি হয় বাঙালি জাতির একমাত্র নিজস্ব আবাসস্থল স্বাধীন বাংলাদেশ। এ কারণেই বাঙালির জীবনে ডিসেম্বর মানেই গর্বের মাস, অহংকারের মাস, মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর মাস, চরম ত্যাগ স্বীকারের মাস এবং অনাবিল আনন্দের মাস। স্বাধীনতার পর থেকেই পুরো বাঙালি জাতি প্রতিবছর বিজয় দিবসকে বেশ ঘটা করে যথাযোগ্য মর্যাদায় যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালন করে আসছে। জাতি স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পার করে এসেছে; কিন্তু এরপরও এই বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের গুরুত্ব একবিন্দুও কমেনি, বরং বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। জাতির এই বিজয় এমন একটি অর্জন, যার গুরুত্ব কোনোদিনই কমবে না। যতদিন থাকবে বাংলাদেশ, যতদিন থাকবে বাঙালি জাতি, ততদিনই এই বিজয় দিবস সমান গুরুত্ব নিয়ে থাকবে আমাদের মাঝে। বরং বাঙালি জাতির উন্নতি এবং এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিজয় দিবসের গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা বেড়ে যাবে অনেক বেশি। যখনই বাঙালি জাতির কোনো অর্জন বা উন্নতির ঘটনা ঘটে, তখনই আমাদের মহান বিজয় দিবসের কথাই সামনে চলে আসে সবার আগে।

আমাদের দেশকে পশ্চিমা বিশ্ব একসময় তলাবিহীন ঝুড়ি বলে আখ্যায়িত করেছিল, অথচে সেই পশ্চিমা বিশ্বই যখন বাংলাদেশের উন্নতি ও সম্ভাবনার কথা বলে, তখন আমাদের প্রথমেই মনে পড়ে বিজয় দিবসের কথা। বাংলাদেশ বিজয়লাভ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল বলেই আজ অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেছে। এমন একসময় ছিল, যখন আমাদের নিজস্ব পাসপোর্ট ছিল না। দু-একজন সৌভাগ্যবান বাদ দিলে কোনো বাঙালি পাকিস্তানি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশ যাওয়ার কথা

আমাদের বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে এসব উন্নত বিশ্বের লাইব্রেরিগুলোয় আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রাম, শিল্প-সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের ওপর রচিত বিভিন্ন বই সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোয় বহুজাতিক সংস্কৃতিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করা হয়

কল্পনাও করতে পারেনি। অথচ আজ সেই বাঙালি জাতির প্রায় এক কোটিরও বেশি জনগোষ্ঠী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মর্যাদার সঙ্গে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। বাঙালি জাতির এমন সফলতার ঘটনায়ও প্রথমেই সামনে চলে আসে আমাদের মহান বিজয় দিবসের কথা। কেননা বাঙালি জাতি বিজয় অর্জন করেছিল বলেই তাদের কাছে আজ বিশ্ব উন্মুক্ত হয়ে গেছে। দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় যখন তিন হাজার মার্কিন ডলারের কাছে চলে যায়, মানুষের জীবনযাত্রার মান যখন উন্নত হয়ে যায়, গ্রামে-গঞ্জের ঘরে ঘরে যখন বিদ্যুৎ পৌঁছে যায়, এমনকি ইন্টারনেট সুবিধা অবারিত হওয়ার ফলে যখন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়; তখনও আমাদের প্রথমেই স্মরণে আসে মহান বিজয় দিবসের কথা। একইভাবে মহাকাশে নিজস্ব স্যাটেলাইট প্রেরণ, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ, ঢাকা শহরে উন্নত যোগাযোগমাধ্যম হিসাবে মেট্রোরেল নির্মাণ, বন্দরনগরী চট্টগ্রামে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম টানেল নির্মাণ, এমনকি সিরাজগঞ্জের মতো ছোট্ট শহরে উন্নত বিশ্বের আদলে উইন্ড মিল নির্মাণ দেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অর্জন। আর এর প্রতিটি অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মহান বিজয় দিবসের গুরুত্বটা বেড়ে যায় অনেক বেশি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল এবং সেই বাংলাদেশ তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফল ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে একটানা দীর্ঘ সময় পরিচালিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল বলেই দেশের আজ এত উন্নতি, এত সফলতা। এভাবেই আগামী দিনেও দেশ যত এগিয়ে যাবে, যত সফলতা ও অর্জনের ঘটনা ঘটবে, তত আমাদের মহান বিজয় দিবসের গুরুত্ব বেড়ে যাবে।

প্রতিবছর মহান বিজয় দিবস আসে নতুন নতুন আশার সঞ্চার করে। জাতিও এই দিবসটি পালন করে নতুন নতুন অঙ্গীকার গ্রহণের মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পার করেছি এবং প্রতিবছরই জাতি যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আমাদের মহান বিজয় দিবস পালন করে আসছে। দেশের বাইরেও এই দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। মূলত বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন বা অ্যাম্বাসি থেকে এই বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়ে থাকে। সাধারণত প্রবাসী বাংলাদেশিরাই এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে থাকেন। আলোচনা, বক্তৃতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আপ্যায়নের ব্যবস্থা থাকে। আমি নিজেও বেশ কয়েকবার কানাডার বাংলাদেশস্থ হাইকমিশন আয়োজিত বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি এবং অনুষ্ঠানটি বেশ উপভোগও করেছি। এটি খুবই প্রশংসনীয় উদ্যোগ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই উদ্যোগকে বিস্তৃত করে আমাদের মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপনে এখানকার মূলধারার জনগণকে ক্রমান্বয়ে সম্পৃক্ত করতে হবে। এটি করতে পারলে এখানকার মানুষ আমাদের দেশ সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারবে এবং আমাদের দেশের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ সৃষ্টি হবে। আমরা স্বাধীনতার ৫০ বছর পার করেছি এবং দেশ এগিয়েছে অনেক দূর। দেশের অর্জন এবং সম্ভাবনার বিষয়ে উন্নত বিশ্বের সংবাদমাধ্যমে বেশ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনাও হয়। কিন্তু তারপরও এখানকার সাধারণ মানুষ আমাদের দেশ সম্পর্কে সেভাবে জানে না। আমাদের দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়ে পাশ্চাত্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আসে। এসব উন্নত দেশের এমন কোনো দোকান খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক বিক্রি হয় না। বিশ্বের যে কোনো দেশের তুলনায় বাংলাদেশে তৈরি পোশাক সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় এসব উন্নত বিশ্বের শপিং-মলগুলোয়। এখানকার মানুষ বাংলাদেশে তৈরি পোশাক ক্রয় করে ব্যবহারও করছে যথেষ্ট। তারপরও এখানকার সাধারণ মানুষ বাংলাদেশের নাম সেভাবে জানে না, যতটা জানে কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম বা ফিলিপাইনের নাম। এর একটাই কারণ, আমরা আমাদের জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে এখানকার মূলধারার মানুষকে সেভাবে সম্পৃক্ত করতে পারি না। সে চেষ্টাও আমাদের হাইকমিশন বা অ্যাম্বাসির পক্ষ থেকে সেভাবে করতে দেখিনি।

এখন সময় এসেছে আমাদের জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন এমনভাবে আয়োজন করার যাতে এখানকার মূলধারার জনগণকে সম্পৃক্ত করা যায়। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো বেশ ঘটা করে তাদের জাতীয় দিবস পালন করে এবং এই দিবস উপলক্ষ্যে এমন সব কর্মসূচি হাতে নেয় যার প্রধান সুবিধা পায় এখানকার মূলধারার সাধারণ মানুষ। ফলে সেসব দেশের জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে এখানকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়, আয়োজকদের ধন্যবাদ জানায় এবং দেশ ও জাতির শুভকামনা করে থাকে। এসব সংবাদ তখন এখানকার মূলধারার মিডিয়ায়ও প্রচারিত হয় এবং এখানকার সাধারণ মানুষ সেসব দেশ ও দেশের মানুষ সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারে। আমাদের দেশের জাতীয় দিবসও প্রবাসে এভাবে উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নেওয়ার সময় এসেছে। বিজয় দিবস উদ্‌যাপন দিয়ে এটি শুরু করা যেতে পারে। আমরা প্রবাসী বাংলাদেশিরা আমাদের জাতীয় দিবস এবং বিজয় দিবস খুব ভালোভাবেই জানি এবং আমরা নিজেরাই এই দিবস পালন করতে পারি। এজন্য এখানকার হাইকমিশন বা অ্যাম্বাসির এই দিবস পালনের অনুষ্ঠান নেহায়েতই আমাদের জন্য আয়োজন করার সেরকম প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। করতে পারলে ভালো, তবে

না করতে পারলেও কোনো সমস্যা নেই। এর পরিবর্তে যদি সেই অনুষ্ঠান এখানকার মূলধারার সাধারণ মানুষের জন্য আয়োজন করা যায়, তাহলে সেটাই হবে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি কার্যকর পদক্ষেপ।

এসব উন্নত দেশের সাধারণ মানুষকে আমাদের দেশের জাতীয় দিবসের ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলতে হলে শুধু গতানুগতিকভাবে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে তা সম্ভব হবে না। তাছাড়া এখানকার সাধারণ মানুষ যে ধরনের অনুষ্ঠানে আগ্রহী হবে, তা আয়োজন করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই এত বিশাল অর্থব্যয় করে কোনো অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় না। অর্থব্যয়ে তো যে কোনো অনুষ্ঠানই করা যায় এবং দ্রুত প্রচারও পাওয়া যায়। কিন্তু অর্থব্যয়ে সাশ্রয়ী হয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন করে উদ্দেশ্য অর্জনের মধ্যেই আছে মুনশিয়ানা। আমাদেরও সেই পথে এগোতে হবে। আমাদের বিজয় দিবস উদ্‌যপান হয় এমন এক মাসে, যে মাস এসব পাশ্চাত্য বিশ্বে অনুষ্ঠানের মাস। ডিসেম্বর আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেমন আমাদের মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপনে মেতে উঠি, তেমনই এই মাস শুরু হতে না হতেই এখানকার জনগণ তাদের বড়োদিন উদ্‌যাপনের উৎসবে মেতে ওঠে। ডিসেম্বরজুড়ে আয়োজন করা হয় নানা অনুষ্ঠান। এসব অনুষ্ঠানের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আমাদের বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের আয়োজনকেও খুব অনায়াসে সম্পৃক্ত করে এখানকার মানুষকে আমাদের দেশ এবং আমাদের জাতীয় দিবসের ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলতে পারি। এখানে বড়োদিনের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে পরিচালিত হয় অনেক খাদ্যভান্ডার বা ফুড ব্যাংক। এসব খাদ্যভান্ডার বিশেষ শ্রেণির মানুষের মাঝে ভালো মানের খাবার সরবরাহ করে থাকে। আমাদের বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে এসব ফুড ব্যাংকে খাবার সরবরাহ করে খুব সহজেই এখানকার মানুষের এবং মিডিয়ার সহানুভূতি লাভ করা সম্ভব। এমনকি ইচ্ছা থাকলে আমাদের বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে এখানকার বিশেষ শ্রেণির মানুষের মাঝে উন্নতমানের খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা আমরা নিজেরাও গ্রহণ করতে পারি। তাছাড়া এখানকার স্কুল-কলেজে এরকম বিশেষ কর্মসূচি পালিত হয়। বিভিন্ন এলাকায়ও পরিচালিত হয় এরকম অনেক আয়োজন। আমাদের বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে এখানকার বিভিন্ন স্কুল এবং এলাকাভিত্তিক অনুষ্ঠানে অবদান রাখতে পারি।

এরকম বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। যৎসামান্য অর্থব্যয়েই এসব কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া সম্ভব। কিন্তু এজন্য প্রয়োজন আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টা। এসব আয়োজনে আমাদের হাইকমিশন বা অ্যাম্বাসির পক্ষে সরাসরি অংশ নেওয়া হয়তো কৌশলগত কারণে একটু কঠিন হতে পারে। তবে তারা এখানে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাধ্যমে এসব অনুষ্ঠানে খুব সহজেই অংশগ্রহণ করতে পারে। এভাবে এখানকার মূলধারার জনগণের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ছাড়া আমাদের দেশের প্রচার সম্ভব নয়। বিশ্বের যেসব দেশ ও প্রতিষ্ঠান আজ বেশি পরিচিত, তারা এভাবেই সেই পরিচিতি অর্জন করেছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশের একটি কোম্পানি ছোটো আকৃতির ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ট্রাক্টর তৈরি করেছিল, যার ভালো চাহিদা ছিল আমেরিকার বাজারে। এত ভালো চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সেই কোম্পানি যখন আমেরিকার বাজারে তাদের প্রডাক্ট বিক্রির জন্য ছাড়ল, তখন আর সেই প্রডাক্ট বিক্রি হয় না। অনেক চেষ্টার পরও যখন সেই প্রডাক্ট বিক্রি হচ্ছিল না, তখন বাধ্য হয়েই সেই কোম্পানি আমেরিকার এক মার্কেটিং কোম্পানিকে দায়িত্ব দেয়। মার্কেটিং কোম্পানি তখন সেই প্রডাক্ট বিক্রির আগে কোম্পানিকে দিয়ে স্থানীয় কিছু জনপ্রিয় স্পোর্টস স্পন্সর করানো শুরু করল। এভাবে বেশ কিছুদিন আমেরিকার কয়েক অঞ্চলের স্থানীয় কিছু স্পোর্টস স্পন্সর করার পর সেই কোম্পানির প্রডাক্ট বাজারে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যায়। এর কারণ, আগে ভালো পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং তারপর অন্যসব ব্যবস্থা। অনেকেই ভাবতে পারেন, বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত একটি কোম্পানিকে এভাবেই আগাতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, যে কোনো ব্যবস্থা যদি একটি কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তাহলে তা একজন ব্যক্তি বা দেশের ক্ষেত্রেও একভাবে প্রযোজ্য হবে। এ কারণেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমদের বিজয় দিবস উদ্‌যাপনে এই অভিনব পন্থা অবলম্বন করেই আমাদের দেশের পরিচিতি দ্রুত ছড়িয়ে দিতে হবে।

আমাদের বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে এসব উন্নত বিশ্বের লাইব্রেরিগুলোয় আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রাম, শিল্প-সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের ওপর রচিত বিভিন্ন বই সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোয় বহুজাতিক সংস্কৃতিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করা হয়। এ কারণেই এখানকার লাইব্রেরিতে বিভিন্ন দেশ এবং জাতিগোষ্ঠীর জন্য পৃথক পৃথক সারিতে অসংখ্য বই রাখা আছে। ইংরেজি এবং সেসব দেশের নিজের ভাষায় লেখা বই এখানার লাইব্রেরিতে রাখা আছে। সে তুলনায় আমাদের দেশের মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস এবং সংস্কৃতির ওপর লেখা বই খুব একটা নেই বললেই চলে। হাতেগোনা কিছু বই থাকলেও এর অধিকাংশ বিকৃতভাবে লেখা। এখন আমাদের দেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম, ইতিহাস ও সংস্কৃতির ওপর লেখা বইয়ের সংখ্যা অনেক। বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও লেখা অনেক বই আছে। তাছাড়া আমাদের বাংলা সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ। আমরা প্রতিবছর আমাদের জাতীয় দিবস, বিশেষ করে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে কিছু বই এখানকার কোনো না কোনো লাইব্রেরিতে বিনামূল্যে সরবরাহ করতে পারি। উল্লেখ্য, এখন উন্নত বিশ্বের লাইব্রেরি আর অর্থব্যয় করে তাদের নিজস্ব সংগ্রহের জন্য বই ক্রয় করে না। তারা এখন অনুদান হিসাবে প্রচুর বই পেয়ে থাকে এবং সেগুলোই লাইব্রেরিতে পাঠকদের জন্য রেখে দেওয়া হয়। এ কারণেই আমাদেরও নিজেদের ইতিহাস, শিল্প-সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের স্বার্থে নিজে থেকেই বিনামূল্যে এখানকার লাইব্রেরিতে বই সরবরাহের উদ্যোগ নিতে হবে। আন্তর্জাতিকভাবে বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এরকম উদ্যোগ নিতে পারলে সবচেয়ে ভালো হবে।

বিগত দুই যুগে আমাদের দেশের অর্থনীতি এগিয়েছে অনেক দূর। বিশেষ করে, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা একটানা দীর্ঘদিন দেশ পরিচালনার সুযোগ পাওয়ায় অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পেরেছেন। যার ফলে দেশের অর্থনীতি এবং আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে উল্লেখ করার মতো। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের উন্নতি এমন সময় সংঘটিত হয়েছে, যখন বিশ্বে একধরনের প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করছিল। উন্নত ও অনুন্নত সব দেশই তাদের স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতেই হিমশিম খাচ্ছিল। এরকম একটি অবস্থার মধ্যে বাংলাদেশের এই অভূতপূর্ব উন্নতি সমগ্র বিশ্বের এক আলোচিত বিষয়। আর এই উন্নতির কারণেই বিশ্বে বাংলাদেশের ব্যাপারে এক বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। এই আগ্রহের ধারাবাহিকতা ধরে রাখা এবং বাংলাদেশকে আরও ইতিবাচকভাবে বিশ্বদরবারে তুলে ধরতে হলে আমাদের আরও বেশি প্রচারের উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের জাতীয় দিবসগুলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে উদ্‌যাপনের মাধ্যমে আমরা সেই প্রচেষ্টা সফল করতে পারি। সেই প্রেক্ষাপটে আমাদের মহান বিজয় দিবস আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উদ্‌যাপনের গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা আজকের দিনে অনেক বেশি।

লেখক: ব্যাংকার, টরন্টো, কানাডা

এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধদিনের কথা

দেবেশ চন্দ্র সান্যাল

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সশস্ত্র সাজে সজ্জিত হয়ে নিরীহ বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, নারী, পুরুষ, শিশু–কেউই তাদের আক্রমণ থেকে রেহাই পাচ্ছে না। নির্বিচারে সবার ওপর গুলি চলছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে রেডিয়োতে দেশব্যাপী হত্যাযজ্ঞ, জ্বালাও-পোড়াও, নারী নির্যাতন ও লুটতরাজের খবর সার্বক্ষণিক প্রচার হচ্ছে। এ ঘৃণ্যতম আক্রমণের দাঁতভাঙা জবাব দিতে এবং দেশকে স্বাধীন করতে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় অঘোষিত বন্ধ। টগবগে ছেলেরা যুদ্ধের ট্রেনিং গ্রহণের জন্য দলে দলে ভারত যাচ্ছে। আবার ট্রেনিং শেষে দেশে প্রবেশ করে বিচ্ছিন্নভাবে শত্রুর মোকাবিলা করছে। এই ট্রেনিংপ্রাপ্তদের কাছেও গোপনে গোপনে দেশের দুরন্ত ছেলেরা যুদ্ধের ট্রেনিং নিচ্ছে। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর গণহত্যা, লুণ্ঠন ও মা-বোনের সম্ভ্রমহরণের চিত্র বিবেকবান মানুষকে বিচলিত করত। তাই প্রতিশোধ। এ প্রতিশোধ নেওয়ার প্রত্যয় থেকে মুক্তিযুদ্ধে যেতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম।

যুদ্ধক্ষেত্রে আমিও যে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পারি–এমন ধারণা, যা যুদ্ধের ভয়াবহতা উপলব্ধি করার যথেষ্ট জ্ঞান তখনও হয়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি এবং মাঝেমধ্যেই হানাদার বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণ, তাদের অদৃশ্য শক্তি প্রদর্শন সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করত এবং মুক্তিযুদ্ধে যেতে বিপুল উৎসাহ জোগাত।

সবেমাত্র সপ্তম শ্রেণি পেরিয়ে অষ্টম শ্রেণিতে প্রবেশ করেছি। বয়স ১৭ বছর। বয়স ও শারীরিক গঠনের কারণে কেউই আমাকে যুদ্ধে যাওয়ার উৎসাহ দিতেন না। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। যুদ্ধে যেতেই হবে। যুদ্ধের প্রাক-প্রস্তুতি হিসাবে অস্ত্রের ট্রেনিং নেওয়া অপরিহার্য। পার্শ্ববর্তী বন্ধুরাষ্ট্রে ভারত ট্রেনিং প্রদানে সর্বাত্মক সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে।

নৌকা ভাড়া করে দলে দলে ভারতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি এবং দলে অন্তর্ভুক্তির জন্য গোপনে তালিকা করা হচ্ছে। কোনোক্রমে তালিকাভুক্ত হতে পারছি না। যেখানেই যাচ্ছি একই

যেখানেই যাচ্ছি একই কথা–আমার যুদ্ধে যাওয়ার বয়স হয়নি। বয়সের ঝুঁকি মনে করে কেউই আমাকে সঙ্গে নিতে চায়নি। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জাতির এই ক্রান্তিকালে আমি মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করব। লুকিয়ে লুকিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকলাম

কথা–আমার যুদ্ধে যাওয়ার বয়স হয়নি। বয়সের ঝুঁকি মনে করে কেউই আমাকে সঙ্গে নিতে চায়নি। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জাতির এই ক্রান্তিকালে আমি মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করব। লুকিয়ে লুকিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকলাম। কখন কোন নৌকা রওয়ানা হয়। ২৩ জুলাই আমাদের প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য অ্যাডভোকেট মো. আব্দুর রহমান স্যারের সঙ্গে আমরা ২২ জন নৌকায় রওয়ানা হলাম মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে ভারতের উদ্দেশে। মধ্যরাতে দেখে-শুনে নৌকা চালিয়ে এভাবে সুজানগর উপজেলার সাতবাড়িয়ার কাছে আমাদের নামিয়ে দেওয়া হলো। হেঁটে হেঁটে সুজানগরের এক আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে উঠলাম। আমাদের পরিকল্পনা ছিল–সুজানগরের কাছের নদী পার হয়ে কুষ্টিয়া জেলার প্রত্যন্ত এলাকা হয়ে ভারতে যাব।

জানতে পারলাম, দিনে নদী পার হওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, দিনের বেলা পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যরা স্পিডবোট নিয়ে নদীপথ টহল দেয়। সন্দেহ হলে গুলি করে নৌকা নদীতে ডুবিয়ে দেবে অথবা ধরে নিয়ে নির্যাতন এবং নৃশংসভাবে হত্যা করবে। সারা দিন সুজানগরে থাকলাম। রাতের খাবার খেয়ে রাত ৯টার দিকে নদী পার হওয়ার জন্য ভাড়া করা ছইওয়ালা নৌকায় উঠলাম। রাত একটার দিকে কুষ্টিয়া জেলার একটি গ্রামে পৌঁছালাম। এক বাড়িতে অতিথি হলাম। বাড়ির মালিক গাছ থেকে কাঁঠাল পেড়ে মুড়ি দিয়ে কাঁঠাল খাওয়ালেন। ওই এলাকার লোকজন কাকা ও জ্যাঠাকে বড়ো আব্বা, ছোটো আব্বা বলে ডাকেন। বাড়ির মালিকের কাছ থেকে জানলাম, ওখানে অবস্থান করাও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। গ্রামে পাকিস্তানি দালাল শান্তি কিমিটির লোক আছে। গ্রাম থেকে অল্প কিছু দূরেই পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য ও রাজাকার ক্যাম্প আছে। পাকিস্তানি দালালরা টের পেলে তারা গিয়ে পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য ক্যাম্পে অথবা রাজাকারদের ক্যাম্পে সংবাদ দেবে। হানাদাররা সংবাদ পেলে এসে ধরবে। নির্যাতন ও নৃশংসভাবে হত্যা করবে। আশ্রয়দাতার বাড়িঘর লুটতরাজ করাবে, অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দেবে। বাড়ির মালিক ও অন্যদের ধরে নিয়ে নির্যাতন ও হত্যা করতে পারে। তিনি তাড়াহুড়া করে ডাল-ভাত রান্না করে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। আমরাও তাড়াহুড়া করে ডাল-ভাত খেয়ে ভোর ৪টার দিকে হেঁটে ভারতের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। রাতটি ছিল মেঘাচ্ছন্ন, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। লাল কাদা মাটির রাস্তা। বৃষ্টিতে ভিজে পিচ্ছিল হয়ে গেছে। এমপিএ স্যারের হেঁটে চলতে কষ্ট হচ্ছে। সবাই ওনাকে ধরে ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেন। ভোরের দিকে বাংলাদেশের সীমান্ত অতিক্রম করলাম। ভারতের নদীয়া জেলার জলঙ্গী সীমান্ত পৌঁছালাম। পাশেই ছিল ভারতীয় সিমান্তবাহিনী বিএসএফ ক্যাম্প। ওনারা আমাদের সহযোগিতা করলেন। আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। যার যার মতো প্রাতঃক্রিয়াদি সেরে হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হলাম। সকালের নাশতা খেলাম। মানি এক্সচেঞ্জ দালালদের কাছ থেকে টাকা বদলিয়ে নিলাম। এমপিএ স্যার আমাদেরকে কামারপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে পৌঁছানোর জন্য বাস ভাড়া করলেন। মালদহ শহরে গিয়ে যাত্রাবিরতি করা হলো। এমপিএ স্যার কাঁঠাল আর মুড়ি কিনে আমাদের খাওয়ালেন। তারপর আমাদেরকে মুক্তিযোদ্ধা ভর্তি ও প্রাথমিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র কামারপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি অস্থায়ী সরকারের অফিস কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। মালদহ থেকে বাস ছাড়ল। রাত ৯টার দিকে আমরা গিয়ে পৌঁছালাম কামারপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে। ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ আমাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। পরদিন মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটমেন্ট কর্তৃপক্ষ আমাদের ফলিং করালেন। আমার বয়স স্বল্পতার কারণে ভর্তি করতে চাইলেন না। ভর্তি কর্তৃপক্ষের একটি দল আমার একটি সাক্ষাৎকার নিল। আমার দেশপ্রেম, সাহসী মনোভাব এবং অন্যান্য অঙ্গীকারের কথা শুনে ভর্তি করলেন। প্রাথমিক ট্রেনিং ক্যাম্পে শুধু আমাদের ফলইন করিয়ে জাতীয় সংগীত গাওয়ানো হতো আর পিটি প্যারেড করানো হতো। কদিন কামারপাড়া যুব প্রশিক্ষণকেন্দ্রে থাকার পর আমাকে ট্রান্সফার করলেন মালঞ্চ ক্যাম্পে। একদিন পর ট্রান্সফার করলেন কুড়মাইল ক্যাম্পে। একদিন পর কুড়মাইল থেকে আমাকে আনা হলো পতিরাম ক্যাম্পে। চারদিন পর পতিরাম ক্যাম্প থেকে একযোগে ইন্ডিয়ান আর্মির লরিতে আমাদের ২০/২২ জনকে নিয়ে আসা হলো ভারতের দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার পানিঘাটা ট্রেনিং সেন্টারে। সেন্টারটি ছিল পাহাড়ের মধ্যে বনাঞ্চলে। ক্যাম্পটি কার্শিয়াং পাহাড় থেকে নেমে আসা একটি ক্যানেলের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত। ক্যাম্পে তাঁবুর মধ্যে আমাদের থাকার সিট করে দিল। রবীন্দ্রনাথ বাগচী, মো. নজরুল ইসলাম, রতন কুমার দাস আর আমি এক তাঁবুর মধ্যে সিট নিলাম। আমাদের ব্যবহারের জন্য প্রত্যেককে একটা মগ, একটা প্লেট ও একটা গেঞ্জি দিল। প্রথমদিনেই প্রশিক্ষণের শুরুতে ক্যাম্পে নিয়মকানুন ও চারপাশের কথা বললেন। প্রধান প্রশিক্ষক

ডিএস ভিলন বললেন, ক্যাম্পের তিনদিকে বিভিন্ন হিংস্র প্রাণী আছে। শুধু মানুষ আর মানুষ। বাংলাদেশ থেকে দলে দলে হিন্দু শরণার্থীরা এখানে এসে জনসংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে। রাস্তার দুপাশে তাঁবুর মধ্যে গাদাগাদি হয়ে শরণার্থীদের বসবাস। সে যে কী করুণ দৃশ্য, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়। আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো মরণটিপা/ময়নাটিপা ক্যাম্পে। মুক্তিযুদ্ধে ট্রেনিং গ্রহণের যোগ্যতা নির্ধারণে এটি প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ের স্থান। টিলার উচ্চতা এত বেশি যে একবার সমতলে নামলে ওপরে ওঠার সাহস হারিয়ে যায়। যাচাই-বাছাইয়ের সময় আবার এই বিপত্তি। আমাকে নিয়ে টানাটানি। এত অল্প বয়স এবং হালকা-পাতলা শরীর নিয়ে যুদ্ধ করার সক্ষমতা নেই মর্মে বিচারকদের ধারণা। হুকুম হলো ভারতের দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ির পানিঘাটা ট্রেনিংয়ে যাওয়ার জন্য।

কখনো স্থলপথে বাস-ট্রাক আবার কখনো জলপথে লঞ্চ-স্টিমারে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে উপস্থিত হলাম পানিঘাটা ট্রেনিং ক্যাম্পে। প্রশিক্ষণের ক্যাম্পটি ছিল ৭ নম্বর সেক্টরের আওতাধীন। ক্যাম্পে সারিবদ্ধভাবে তাঁবু নির্মাণ করা হয়েছে। এক তাঁবুর মধ্যে মাটিতে খেজুরের পাটি, এর ওপর ছনের বিছানা। কয়েকটি কোম্পানিতে বিভক্ত করে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। অ্যালফাবিটিক্যাল অর্ডারে কোম্পানির (আর্মিদের প্লাটুন, কোম্পানি থাকে) নামকরণ করা হয়েছে।

যেমন: 'এ' কোম্পানিকে আলফা, 'বি' কোম্পানিকে বেটা প্রভৃতি। আমি অন্তর্ভুক্ত হলাম বা বেটা কোম্পানি বরাদ্দ পেয়ে লাইনে দাঁড়ালাম। তরঙ্গপুর থেকে আমাদের প্রত্যেকের নামে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ইস্যু করা হলো। ১০ জনের সমন্বয়ে একটি গ্রুপ করা হলো। সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার তামাই গ্রামের এমএ মান্নান আমাদের গ্রুপ লিডার নিযুক্ত হলেন। ডেপুটি লিডার নিযুক্ত হলেন শাহজাদপুর উপজেলার জমিরতা গ্রামের রবীন্দ্রনাথ বাগচী। আমার নামে ব্রিটিশ থ্রি-নট-থি একটি রাইফেল ও এক ম্যাগাজিন গুলি, হেলমেট ইস্যু করা হলো। সব গোলাবারুদ, মাইন, ২ক্ষ মর্টার ও অন্যান্য এক্সপ্লোসিভ সরবরাহ করলেন আমাদের কমান্ডার স্যার এমএ মান্নান সাহেবের কাছে। আমাদের মাসিক ৬০ টাকা হারে রেশনিং অ্যালাউন্স ও ৫০ টাকা হারে পকেট মানি দিলেন। সনাতন ধর্মানুসারে যুদ্ধে জয়ের জন্য দুর্গাস্তর করতে হয়। তাই তরঙ্গপুর বাজার থেকে আমি একখানা শ্রীশ্রী চণ্ডীগ্রন্থ ক্রয় করলাম। যুদ্ধে যে কোনো সময় মারা যেতে পারি। আমি মারা গেলে রণাঙ্গনের অন্য সহযোদ্ধারা যাতে জাতীয় পতাকা দিয়ে মুড়িয়ে আমার মৃতদেহটা জলে ভাসিয়ে দিতে পারেন, সেজন্য একটি বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত জাতীয় পতাকা ক্রয় করলাম। রণাঙ্গনের উজ্জীবিত হওয়ার জন্য স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান ও সংবাদাদি শোনার জন্য একটি ৪ ব্যান্ডের রেডিয়ো ক্রয় করলাম। ১৯৭১ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তরঙ্গপুর থেকে আমরা রওয়ানা হলাম। কিছু দূরে বাসে এসে একটা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠলাম। শিলিগুড়ি রেলওয়ে জংশন স্টেশনে এসে আমাদের ট্রেন বদলাতে হলো। শিলিগুড়ি স্টেশনে ৩/৪ ঘণ্টা অবস্থানের পর আসামগামী ট্রেন এলো। আসামগামী ট্রেনে আসাম জেলার ধুবরী স্টেশনে নামলাম। এরপর বাসে ৫ সেপ্টেম্বর মানিকার চর পৌঁছালাম। মানিকার চর পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত হয়ে গেল। ওই রাত মানিকার চরে একাটি বোর্ডিংয়ে থাকলাম। পরদিন সকালে নদীর পার হয়ে এলাম রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম (মহকুমার বর্তমানের জেলা) রৌমারী ক্যাম্পে। এখানে আমাদের স্নান, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হলো। সিরাজগঞ্জে যমুনার চরে পৌঁছানোর চুক্তিতে কমান্ডার স্যার একটি ছইওয়ালা নৌকা ভাড়া করলেন। ৬ সেপ্টেম্বর রাতের খাবার খেয়ে ৯টার দিকে আমাদের নৌকা ছাড়ল। নৌকা বাহাদুরাবাদ ঘাটের সম্মুখ দিয়ে আসতে হয়। রৌমারী ক্যাম্প থেকে আমরা জানতে পেরেছিলাম বাহাদুরাবাদ ঘাট এলাকা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ঘাটের অদূরে পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার ক্যাম্প আছে। তারা ভয়ানক খারাপ, স্পিডবোট দিয়ে রাতে নদী টহল দেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের নৌকা পেলে ধরে নিয়ে যায়। ক্যাম্পে নিয়ে অমানুষিক অত্যাচার করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। আমাদের কমান্ডার স্যার নির্দেশ দিলেন–আমরা সবাই ডওরার মধ্যে পজিশন অবস্থায় থাকব। পাকিস্তানি হায়েনারা ধরতে এলে আমরা ধরা দেব না। যুদ্ধ করব। যুদ্ধ করে শহিদ হব। কিন্তু ওদের হাতে ধরা দেব না। রাত ২টার দিকে আমরা বাহাদুরাবাদ ঘাট এলাকা অতিক্রম করতে থাকলাম। ঘাট থেকে হানাদারদের সার্চলাইটের আলো এসে বারবার আমাদের নৌকার ওপর পড়ছিল। ভগবানের কৃপায় ওরা আর স্পিডবোট নিয়ে ধরতে এলো না। আমরা ঝুঁকিপূর্ণভাবে বাহাদুরাবাদ ঘাট এলাকা অতিক্রম করলাম। আমাদের চিড়া ও গুড় ছিল। ভোরে এক কাইসা খেতের মধ্যে নৌকা ঢুকিয়ে দিল। আমরা সবাই খেতের মাঠে প্রাতঃক্রিয়া সারলাম। আজ রাতে এ গ্রামে, কাল রাতে ও গ্রামে শেল্টার থাকল। সকালে অস্ত্রে ফুল থ্রু মারতাম। অস্ত্র পরিষ্কার করে তেল দিতাম। তখন গুটিকয়েক স্বাধীনতাবিরোধী ছাড়া অধিকাংশ মানুষ ছিল মুক্তিযুদ্ধ ও আওয়ামী লীগের পক্ষে। তবুও অনেকেই পাকিস্তানি হানাদার ও রাজাকারদের ভয়ে আমাদের থাকার জায়গা ও খাবার দিতে চাইতেন না। পাকিস্তানের দালাল ও রাজাকার ক্যাম্পে খোঁজ দিয়ে নিয়ে এসে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেবে, লুটতরাজ করাবে, বাড়ির মালিককে ধরে নির্যাতন করবে। গ্রামে হত্যা, গণহত্যা, নারী নির্যাতন প্রভৃতি মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড চালাতে পারে। আবার কিছু বাড়ির মালিক ছিল নির্ভীক। তারা আশ্রয় ও খাবার দিতেন। আমরা কখনো কখনো স্কুলে আশ্রয় নিয়ে থাকতাম। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ গোপনে আমাদের খাদ্য সরবরাহ করতেন। আমাদের সঙ্গে সব সময় চিড়া-গুড় থাকত। কোনোদিন খাবার পেতে সমস্যা হলে আমরা চিড়া-গুড় খেয়ে থাকতাম। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক কিছু যুবককে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ করিয়ে আমাদের সঙ্গে নিলাম। তারা রেকি ও অন্যান্য কাজে আমাদের সহযোগিতা করত। আমরা কোনো থানা, পাকিস্তানি হানাদার ক্যাম্প, রাজাকার ক্যাম্পে আক্রমণ করার আগে রেকি করতাম। আমি ছোটো হওয়ায় অধিকাংশ রেকিতে অন্যদের সঙ্গে আমি থাকতাম। আমরা বেলকুচি থানা আক্রমণ যুদ্ধ, কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে স্টেশনসংলগ্ন রাজাকার ক্যাম্প এ্যাম্বুস, বেলকুচি থানার কল্যাণপুর যুদ্ধ এবং শাহজাদপুর উপজেলার ধীতপুর নামক ভয়াবহ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। সব যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকারদের বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে বিজয়ী হয়েছি।

১ ডিসেম্বর কোনো সংঘাত ব্যতিরেকে শাহজাদপুর থানা শত্রুমুক্ত হয়। দীর্ঘ সংগ্রাম ও নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আসে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। সবার বাঁধভাঙা আনন্দ। তবে এ আনন্দ অর্জিত হয় লাখ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে আর এর সঙ্গেই সমাপ্তি ঘটে মহান মুক্তিযুদ্ধের। পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ, লাল-সবুজের বাংলাদেশ। বিজয়পরবর্তী সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ন্যাশনাল মিলেশিয়া ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ বাগচীর নিয়ন্ত্রণে অস্ত্র জমা দিয়ে রওয়ানা হলাম বাড়ির উদ্দেশে। আমরা দুই সহোদর একই গ্রুপের সহযোদ্ধা আব্দুল সামাদ, আব্দুল কাসেম, আজিজুর ও মামা হক একসঙ্গে বাড়ি পৌঁছে গেলাম। শুধু বাড়ির লোকই নয়, গ্রামের অনেক লোকই আমাকে দেখতে এলো, আদর করল, আর প্রশংসা করল আমার কিশোর বয়সের সাহসিকতা ও বীরত্বের।

লেখক: কলামিস্ট, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার

বাঙালির হৃদয়-মননে ডিসেম্বর

জাফর ওয়াজেদ

বাঙালির হৃদয়-মননে ডিসেম্বর; মূলত বিজয়ের মাস। পাশাপাশি স্বজন হারানোর বেদনার মাস। একই সঙ্গে স্বাধীনতাবিরোধী, যুদ্ধাপরাধীদের জন্য আতঙ্কের দিবস। ৫১ বছর আগে সেই ১৯৭১ সালে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি (যা আজ ১৭ কোটি ছাড়িয়েছে) নবজীবন পেয়েছিল এই ডিসেম্বরেই। মনে হয়েছিল তাদের, এক ভয়ংকর বিভীষিকাময় সুদীর্ঘ কালরাত্রি শেষে গৌরবোজ্জ্বল ভোরের মুখ দেখেছিল। বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে একটি সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল সেদিন। যে জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল না পূর্বসূরিদের। সেদিন বাঙালি তেমন একটি নতুন জীবনপ্রবাহে প্রবেশ করেছিল। আজ থেকে একান্ন বছর আগে ষোলোই ডিসেম্বরে ঘটেছিল সেই ঘটনা। সাড়ে সাত কোটি প্রাণপ্রহরী প্রদীপ জ্বেলে মুক্তির জয়গান গেয়ে উঠেছিল। যদিও তখনও দেশের অনেক স্থানে শত্রুরা আত্মসমর্পণ করেনি। লড়াইয়ের ময়দানে তখনও মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনীর সমর্থিত মিত্রবাহিনী হানাদারদের পর্যুদস্ত করার জন্য ছিল সক্রিয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ। কিন্তু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ অস্ত্রের জোরে দখল করে নেয়। এর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র বাঙালি ক্রমে সশস্ত্র হয়ে ওঠে। গড়ে তোলে প্রতিরোধ। রণাঙ্গন থেকে রণাঙ্গনে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। সেসব মুক্তিযোদ্ধা জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য হিসাবে ধারণ করে সম্মুখে শত্রুহননে মত্ত হয়েছিল। সেসব দিনের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও ইতিহাস আজও মেলেনি। সবই খণ্ড খণ্ড চিত্র। সেই বীরত্বগাথা ধরে রাখার চেষ্টা তেমন হয়নি। মুক্তিযোদ্ধারাও ক্রমেই এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। ক্রমেই কমে আসছে তাঁদের সংখ্যা। বীরের মতো যাঁরা লড়াই করেছেন, তাঁদের একটিই লক্ষ্য ছিল–দেশকে হানাদারমুক্ত করা। পুরো নয় মাস তাই চলেছে মুক্তির যুদ্ধ।

এবারের বিজয় দিবস সামনে রেখে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক তরুণ কিশোর জানতে চেয়েছে, নয় মাসকে কেন স্বাধীনতার যুদ্ধ বলা হবে না। স্বাধীনতাযুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের যে

যে ইতিবাচক জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণ মুক্তিসংগ্রাম করেছিল, সেই চেতনাকে সমাজের সর্বস্তরে প্রোথিত করার পরিবর্তে তার প্রাণশক্তিতে মারাত্মক আঘাত হেনেছে জান্তা শাসকরা আর তাদের স্নেহধন্য একাত্তরের পরাজিত শক্তি ও যুদ্ধাপরাধীরা। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভূলুণ্ঠিত করেছিল

তফাত, তা তার ধারণায় সন্নিবেশিত না হওয়ার কার্যকারণ পঁচাত্তর-পরবর্তী ইতিহাস পালটে দেওয়ার কারণে। রাজাকার পুনর্বাসনকারী ও ক্ষমতা দখলকারী সামরিক জান্তা জিয়াউর রহমান ২৬ মার্চকে জাতীয় দিবস হিসাবে অভিহিত করে এক সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রকে প্রাধান্য দিয়েছিল। সর্বচেষ্টা চালিয়েছিল ইতিহাসকে তার নিজের মতো গড়ার। সে সাময়িকভাবে পাকিস্তানি ভাবধারাও ফিরিয়ে এনেছিল।

বাঙালি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু করে সেই বায়ান্ন সালে। ভাষা আন্দোলন বাঙালিকে তার স্বকীয়তা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে সামনে এনেছিল। নামিয়ে দিয়েছিল লড়াইয়ের, সংগ্রামের ময়দানে। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন শেষে বাঙালি স্বাধীনতা পেয়েছিল একাত্তরের ২৬ মার্চ। বায়ান্ন থেকে যে লড়াই শুরু হয়েছিল, তারই পরিণতি ২৬ মার্চ, একাত্তর ঘটেছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওয়্যারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে। উচ্চারণ করেন, 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।' কিন্তু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী স্বাধীন বাংলাদেশ দখল করে নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। দেশকে হানাদারমুক্ত করে স্বাধীনতা বহাল রাখার জন্য বাঙালি সশস্ত্র যুদ্ধ করেছিল বলে নয় মাস ধরে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়েছিল। কিন্তু সেই স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার জন্য ঘটানো হয়েছিল পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট; যার ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। স্বাধীনতার শত্রুরা এখনো তাই তৎপর। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর স্বাধীনতা আবার আশীর্বাদস্বরূপ ফিরে এসেছে। বাঙালির মনে আবার স্বাধীনতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। অবশ্য এটা ঠিক যে, স্বাধীনতার অনুমতি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু স্বাধীনতার আচরণ সমান মূল্যবান। তথাপি স্বাধীনতার আচরণবিধি যদি সমাজের অভিজ্ঞতায় তৈরি না হয়, তাহলে স্বাধীনতার অনুমতি ঘটাতে পারে অনর্থ। স্বাধীনতা কিন্তু বুদ্ধির ব্যাপার নয়। স্বাধীনতা মনের ও মেজাজের ব্যাপার। ইতিহাসে যদি প্রমাণ খোঁজা হয় যে স্বাধীনতা মানুষের প্রগতির একমাত্র পথ, তাহলে ব্যর্থ হতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন, ইতিহাসের নজির খুঁজে কিছুই প্রমাণ করা চলে না। প্রথমত, কোনো ঘটনা একবার কিংবা অনেকবার ঘটেছে, অতএব আবার ঘটবে, এই বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য নয়। দ্বিতীয়ত, একই কারণ ইতিহাসে একই ফল নাও আসতে পারে। প্রকৃতি এবং ইতিহাসের এখানেই পার্থক্য। তৃতীয়ত, ইতিহাসের কোনো যুক্তি বা ছক নেই। ইতিহাসবিদ গনতকার নন। যারা ইতিহাসের আইনে বিশ্বাস করেন, তারা স্বাধীনতার শত্রু। তলিয়ে দেখলে স্বাধীনতার প্রত্যয় মানুষের আত্মসম্মানের অনুভূতি। আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ মানেই কিছু কিছু অধিকার জন্ম অধিকার বলে মনে করেন। নিজে বিভিন্ন অধিকার দাবি করব, অন্যকে দেব না–এমনটি হওয়া উচিত নয়। সেজন্য আত্মসম্মানবোধ থেকে মানুষের মর্যাদা, ব্যক্তির অধিকার এবং সমাজে স্বাধীনতার প্রত্যয় জন্মায়। সমাজভেদে স্বাধীনতা এবং অধিকারের বোধ পালটায়। কিন্তু আধুনিক স্বাধীনতা বিশ্বজনীন হয়েছে। কার্যকর হয়েছে কি না, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু বিভিন্ন সংস্কৃতিতে একই স্বাধীনতা আজ স্বীকৃত। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এই স্বীকৃতি দৃঢ় হয়। কোনো বিশেষ সিদ্ধান্তে যদি পৌঁছতে হয়, তাহলে খোলা মনে, সব যোগ্য লোকের সঙ্গে, সযত্নে সমস্যা নিয়ে আলোচনা কর্তব্য। নতুবা সিদ্ধান্তে ভুল হতে পারে। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সেজন্য স্বাধীনতা আবশ্যক। মানুষের মর্যাদা এবং শিক্ষার প্রয়োজন; এ দুই বস্তু স্বাধীনতাকে আধুনিক মানুষের মনে ধরে রেখেছে। সমাজ পালটাচ্ছে; কিন্তু স্বাধীনতার ইচ্ছা থাকছে। স্বাধীনতার আচরণবিধিতে সেজন্য থাকা দরকার মানুষকে মানুষ বলে স্বীকার করা ও মর্যাদা দেওয়া এবং সযত্ন সর্বজনীন আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়া। সমাজের জীবনে, দৈনন্দিন ব্যবহারে এই দুটি প্রত্যয় যদি ফুটে ওঠে, তা হলে নির্বাচনে চাতুরী বা রাজনৈতিক পটুত্বে রাষ্ট্র চালনা সম্ভব হয়। কিন্তু স্বাধীনতা যেহেতু মানুষের মেজাজে থাকে, সেজন্য আইন করে স্বাধীনতা সৃষ্টি করা চলে না। আইন অনুমতি দিতে পারে, আইন নিষেধ করতে পারে; কিন্তু আইনের জোরে মেরুদণ্ডহীন মানুষ মেরুদণ্ড লাভ করে না। আত্মসম্মান যদি না থাকে তবে স্বাধীনতার বোধ আসতে পারে না। এখন ভারত উপমহাদেশের মানুষ মেরুদণ্ডহীন এ কথা মনে করার কারণ আছে। যদিও এই আবিষ্কারে ভেঙে পড়ার কারণ দেখা যায় না। এ সমস্যা জটিল এবং সংক্ষেপ-সরল করে বলার চেষ্টা শোনাতে পারে বেয়াদবি। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে বাঙালি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ধর্ম-সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের নাম ও নিশানা মুছে দেয় বাংলাদেশের মাটিতে। মুক্ত হয়েছিল শোষক উচ্চবিত্ত শ্রেণি এবং অর্ধশিক্ষিত অথবা কুশিক্ষিত একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উন্নাসিক সংস্কৃতির নাগপাশ থেকে। এ দেশের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, আদিবাসী মিলে এক অভিন্ন জাতি হিসাবে ১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থান করেছিল, বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করে এনেছিল কারাগার থেকে। তেমনই হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান মিলে অভিন্ন বাঙালি জাতিরূপে তাঁরা যুদ্ধ করেছে, মরেছে এবং খতম করেছে বর্বর পাকিস্তানি হানাদারদের শক্তি। তারপরও সাড়ে তিন বছরের অধিককাল বাঙালি জাতি জাতীয়তা, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্রকে জাতীয় চার লক্ষ্যাদর্শরূপে রক্ষা করেছে। জয় বাংলাকে রেখেছে তার জাতীয় জীবনের স্লোগান হিসাবে। এসবই তো আধুনিক জগৎ এবং আধুনিক ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার নীতি ও পথ।

মুক্তিযুদ্ধের নেতৃস্থানীয় কারও কারও মত এই যে, তারা যুদ্ধ করতে চাননি; যুদ্ধ তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আত্মরক্ষার জন্য সক্রিয় হওয়া স্বাভাবিক জৈবধর্ম। জৈবধর্মের সঙ্গে বিমূর্ত

লক্ষ্যাদর্শে তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। তেমনই আত্মরক্ষা এবং আত্মবিস্তার এক বস্তু বা জিনিস নয়। যে বিমূর্ত চেতনাবোধ আধুনিক ভৌগোলিক জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টির ভিতভূমি এবং এর মূল সার্বক্ষণিক শক্তি, যার নাম জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজম। আত্মরক্ষার বিষয়টি জীবদেহের স্বভাবজাত, স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া। তাই নেতিবাচক জৈবধর্ম। পাকিস্তান আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ায় আমরা যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলাম–এ চিন্তার মধ্যে একটি আলাদা জাতিরূপে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যাদর্শে উদ্বুদ্ধ জনতার আক্রমণাত্মক অভিযানের দৃঢ় সংকল্প নেই। অথচ আধুনিক ইতিহাস প্রমাণ দিচ্ছে যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের প্রতিটি জাতীয় যুদ্ধ প্রকৃতই আক্রমণাত্মক যুদ্ধ। বিদেশি শাসককে বিতারিত করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ জাতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শত্রুকে আক্রমণ শুরু করে। এখন হতে দুইশ বছর আগে মার্কিন জাতি ব্রিটিশ প্রভুদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করেছিল, অভিন্ন ধর্ম, জাতীয় চেতনা সম্প্রসারণ ও কেলাসনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার আগেই তারা একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিরূপে বিদেশি সেনাবাহিনী বিতাড়নের সংগ্রাম শুরু করেছিল। জয়লাভের এত বছর পর কোটি কোটি মার্কিন তাদের জাতীয় দিবসে রাজপথে বেরিয়ে আন্দোলনেও মত্ত হয়। দুর্ঘটনা ঘটিয়ে মরেও শত শত লোক। বাংলাদেশেও '৭৫-পরবর্তী দুঃশাসনকালে বিজয় দিবসে বৃহত্তম বাঙালি জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দোল্লাস ও সংযোগ দেখা যায়নি।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হতে থাকলে বিজয় পতাকা হাতে অগণিত মানুষ বেরিয়ে আসে রাজপথে। বিজয় দিবসে তরুণ প্রজন্মের আনন্দ আর উল্লাস থাকে অনির্বাণ জ্বলতে থাকা দীপশিখার মতো প্রজ্বলিত

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হতে থাকলে বিজয় পতাকা হাতে অগণিত মানুষ বেরিয়ে আসে রাজপথে। বিজয় দিবসে তরুণ প্রজন্মের আনন্দ আর উল্লাস থাকে অনির্বাণ জ্বলতে থাকা দীপশিখার মতো প্রজ্বলিত। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরক্ষর, উৎপীড়িত জনসাধারণ এবং সরাসরি তাদের মধ্য থেকে আগত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ইতিবাচক জাতীয় চেতনা তার আক্রমণাত্মক বৈপ্লবিক ভূমিকা নিয়েই সক্রিয় ছিল। চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ থেকে আত্মরক্ষার নানাবিধ জৈব স্বয়ংক্রিয়তা নিঃসন্দেহে একটি চাপ। কিন্তু শত্রুপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করাও এ চাপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পন্থা হিসাবে গণ্য। তাই এক্ষেত্রে বিমূর্ত চিন্তাভাবনা ও লক্ষ্যাদর্শ গৌণ বিষয়। পক্ষান্তরে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যাদর্শে উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত কোটি কোটি সাধারণ মানুষের অপ্রতিরোধ্য সংকল্প সম্পূর্ণ অন্য ধরনের চাপ। এ চাপ ইতিবাচক, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন তার লক্ষ্য। পালিয়ে এ চাপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় নেই। অপ্রতিরোধ্য ইতিবাচক চাপে পড়েই পাকিস্তানি আমলের বিশেষ সুবিধাভোগী বাঙালি শ্রেণিটি মুক্তিসংগ্রাম এবং শেষ পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে শরিক হয়েছিল অথবা সহযোগিতা করেছিল। ব্যতিক্রম সব ক্ষেত্রেই থাকে। ব্যতিক্রম বাদ দিলে, সেসময়ের বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণিটির মস্তিষ্ক পূর্ববৎ বিশৃঙ্খল চিন্তার উর্বর ভূমি হিসাবেই বহাল ছিল। আধুনিক জগতের ঐতিহাসিক বাধ্যবাধকতার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন জিন্নাহর ধর্ম-সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রতিবর্তী ক্রিয়া থেকে তারা যে কারণে মুক্ত হতে পারেনি, তা হচ্ছে একদিকে ধর্মের নামে ধর্মের ব্যাবসা শ্রেণিটির বিশেষ সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণ ও পরিবৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক। অপরদিকে মার্কিন, ফরাসি, ব্রিটিশ এমনকি আলজিরীয়, লাওসি ও ভিয়েতনামিদের মধ্যে যে ধর্মনিরপেক্ষ ইতিবাচক জাতি চেতনার সঞ্চার নানা আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক বিবর্তন ক্রিয়ার মধ্যে হয়েছিল, বাংলাদেশের বিশেষ সুবিধাভোগী এবং ক্ষমতাবান উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে অনুরূপ অবিভাজ্য জাতীয় চেতনার আনন্দ উদ্ভব হয়নি। তবে পশ্চাৎপদতার মূলে রয়েছে বাংলার ধর্ম সাম্প্রদায়িকতাহীন মানবিক লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্রহীন এক অভিনব উন্নাসিক আভিজাত্যবোধ। ব্রিটিশদের গোলামি এই উন্নাসিক সংস্কৃতির জনক, মুক্তিসংগ্রামে অংশ নেওয়ার মধ্যে জাগ্রত জনতার চাপ এবং আত্মরক্ষার জৈব চাপ ছাড়াও অন্য একটি আকর্ষণ ছিল। প্রভুরা বিতাড়িত হলে আসনগুলো খালি হবে। শূন্য আসনগুলোর মানমর্যাদা ও পদবি বহাল রেখে সেগুলোয় বসার বাসনা তাদের অর্ধমগ্ন চেতনায় সক্রিয় ছিল। স্বাধীনতার চিহ্নিত শত্রুদের যোগসাজশে শ্রেণিস্বার্থান্ধ সামরিক জান্তা শাসকরা দেশকে পুনরায় বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খল চিন্তার পঙ্কিল আবর্তে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তারা সংবিধানের মূল নীতিকে ধ্বংস করেছে। কখনো ধর্মের নামে, কখনো কোটারি স্বার্থের তাগিদে, কখনো ক্ষমতার আকর্ষণে আনুগত্যকে দেশমুখী আনুগত্য অথবা দেশপ্রেমরূপে প্রচার করেছে। যে ইতিবাচক জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণ মুক্তিসংগ্রাম করেছিল, সেই চেতনাকে সমাজের সর্বস্তরে প্রোথিত করার পরিবর্তে তার প্রাণশক্তিতে মারাত্মক আঘাত হেনেছে জান্তা শাসকরা আর তাদের স্নেহধন্য একাত্তরের পরাজিত শক্তি ও যুদ্ধাপরাধীরা। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভূলুণ্ঠিত করেছিল। সেই অবস্থা ঘুচে গেছে?

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ফিরিয়ে নিয়েছে। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য জাতি হিসাবে বাঙালি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন স্মার্ট বাংলাদেশের পথে হাঁটছে। বিজয় পতাকা হাতে বাঙালি তাই ছুটে চলছে অবিরাম অগ্রগতির সোপান ধরে। বিজয় দিবস এবারও নতুন উদ্দীপনা নিয়ে এসেছে নতুন প্রজন্মের কাছে। তারা বিজয়ের গান গেয়েছে। শ্রদ্ধা জানিয়েছে লাখো শহিদের প্রতি। দেশরক্ষা ও গড়ার শপথ নিয়েছে। একাত্তরে যেমন ভাবতাম, বিজয় পতাকা হাতে যাঁরা আসে তাঁরা আমারই ভাই। এই সুবর্ণজয়ন্তীকালের মধ্যগগনে দাঁড়িয়ে আবারও একই উচ্চারণ করতে হয় তরুণ প্রজন্মকে সামনে রেখে। দেশ তার হারানো গৌরবকে আবার ফিরে পাচ্ছে। আবার ধ্বনিত হচ্ছে ক্রমাগত 'জয় বাংলা'।

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও
মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)